শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজভাবনার দ্বিমাসিক

আল-আমীন বার্তা

জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৯

খবরে আল-আমীন মিশন: ১৯৯৮-২০১৭

- একটি পিছিয়ে পড়া সমাজকে টেনে তুলছে আল-আমীন মিশন। —অশোককুমার কুণ্ডু, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪.০৮.১৯৯৮।
- দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের খুঁজে চলেছে আল-আমীন মিশন। —অশোককুমার কুণ্ডু, আনন্দমেলা, ০১.০৩.২০০০।
- বাঙালি মুসলিমদের শিক্ষায় নবজাগরণের নয়া তীর্থ। —আবদুর রাউফ, সংবাদ প্রতিদিন, ১৪.১২.২০০০।
- বিদ্যার অভিনব সূর্যোদয়: আধুনিক শিক্ষাখাতে যাকাত ও ফিতরার অর্থ-সম্পদের ব্যবহার প্রায় দেখাই যায় না। এদিক থেকে আল-আমীন মিশনের আরম্ভ, নির্মাণ ও বিস্তার অবশ্যই একটি নিঃশব্দ বিপ্লব। —বাহারউদ্দিন, আজকাল (রবিবাসর), ১৮.১১.২০০১।
- দানের টাকায় আধুনিক শিক্ষা, একটি স্বপ্নের নীরব অভিযান। —মিলন দত্ত, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪.০২.২০০২।
- Mainstream reform from within –Madhumita Bhattacharyya, The Telegraph, 10.09.2002.
- একটি স্কুলের ভর্তিপরীক্ষা, নবজীবনের প্রবেশ পথ। —একরাম আলি, আজকাল, ০৪.০৪.২০০৩।
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য দৃষ্টান্ত। —সম্পাদকীয়, কালান্তর, ০৯.০৮.২০০৩।
- ইচ্ছে হাওয়ায়। —কবীর সুমন, আজকাল, ১৭.০৭.২০০৪।
- ধর্ম, সমাজ, ঘেরাটোপ—ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে। —বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২.১২.২০০৫।
- School Bells Echo Amidst Paddy Fields: Al-Ameen Mission has today become a model for excellent education standards. –Islamic Voice, February 2006.
- Hope for Hopeless: It's school that gives those children a chance who have not a penny of their name –Nisha Lahiri, The Telegraph, 02.06.2006.
- রাজ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার নবজাগরণ। —অঞ্জন বসু, সংবাদ প্রতিদিন, ০৩.০২.২০০৭।
- আল-আমীন মিশন—প্রতিশ্রুতির অন্য নাম। —এস এম সামসুদ্দিন, একদিন, ০২.০৩.২০০৭।
- মূল স্রোতে। —সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮.০৫.২০০৭।
- Mission Launchpad for poor student –Jhimli Mukherjee, The Times of India, 01.06.2007.
- আল-আমীনের সাফল্য: আত্মশক্তিতে ভরপুর বাঙালি মুসলমানরা। — শেখ ইবাদুল ইসলাম, একদিন, ০১.০৬.২০০৭।
- আল-আমীন মিশন: স্বপ্ন পূরণের মাইল ফলক। —মহ. সাদউদ্দিন, কালান্তর (রবিবারের পাতা), ১০.০৬.২০০৭।
- Sustained by Donations, Al-Ameen Mission is providing mainstream learning to the community's children. Rajdeep Datta Roy, Live mint.com, The Wall Street Journal, 18.12.2007.
- Mission Possible: It has scripted many a turnaround: picking up poor kids, tutoring them and seeing them off on the road of success. –Jayanta Gupta & Subhro Maitra, The Times of India, 30.04.2008.
- Deprived kids blaze trail of glory: House of dreams. The Al-Ameen Mission has been nurturing talent from underprivileged Muslim Families. –Sumati Yengkhom, The Times of India, 28.05.2010.
- Al-Ameen Mission-Shelter & Studies. –Bibhas Bhattacharyya, Hindusthan Times, 23.06.2010.
- গৌরব, লজ্জা— সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯.০৫.২০১২।
- A mission that changes lives, helps dreams soar. –The Times of India, 28.05.2013.
- নতুন তারার জন্ম আল-আমিনে। —কৌশিক সরকার, এই সময়, ০৪.০৬.২০১৩।
- সমাজের অন্দর থেকে। —তাজুদ্দিন আহ্‌মেদ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১.০৯.২০১৩।
- আল-আমীন মিশন এক মরূদ্যান, এক অনুঘটক। —একরামুল হক শেখ, স্বভূমি, ০৯.০৩.২০১৪।
- দারিদ্র্য জয় করে উজ্জ্বল আল-আমীন মিশন। —সোমনাথ মণ্ডল, আজকাল, ৩১.০৫.২০১৪।
- আল-আমীনের ছায়ায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন ওঁরা। —মনিরুল শেখ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫.০৫.২০১৫।
- Al-Ameen takes mission to Ranchi and Assam. –Sumati Yengkhom, The Times of India, 19.06.2015.
- আল-আমীন মিশন: পায়ে পায়ে তিন দশক। —এস এম সিরাজুল ইসলাম, একদিন, ০৯.০৮.২০১৬।
- Al-Ameen Mission: West Bengal – Reforming the Society Silently. –Dr. Sadath Khan, Islamic Voice, December 2016.
- Minority Medicine: Muslims of Bengal are embracing education to break free from a certain way of life and age-old stereotyping. –Sonia Sarkar, The Telegraph, 10.09.2017.

আল-আমীন বার্তা

পৌষ-চৈত্র ১৪২৫ । জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৯

জমাদিউল আওয়াল-শাবান ১৪৪০ • নবম বর্ষ • প্রথম-দ্বিতীয় যুগ্ম সংখ্যা

পরামর্শ পরিষদ

একরাম আলি সেখ মহম্মদ হাসান সেখ মারুফ আজম

এম আব্দুল হাসেম মাইনুদ্দিন আহমেদ

সম্পাদক

এম নুরুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক

শেখ হাফিজুর রহমান

সম্পাদনা সহযোগী

দিলদার হোসেন একরামূল হক শেখ

আসাদুল ইসলাম সেলিম মল্লিক

জনসংযোগ

মহম্মদ আসরাফুল হোসেন মহম্মদ আলমগীর বিশ্বাস

সেখ মোমিনুর রহমান তসলিম আরিফ

সেখ মহম্মদ ইস্রাফিল মহম্মদ মহসীন আলি

ইন্টারনেট সংস্করণ

আব্দুল কাইয়ুম বিশ্বাস

বর্ণস্থাপন এবং গ্রাফিক্স

মহম্মদ গোলাম কিবরীয়া

আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম কর্তৃক প্লট নং ডি জে ৪/৯, অ্যাকশন এরিয়া ১, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং ডায়মন্ড আর্ট প্রেস ৩৭এ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯ থেকে মুদ্রিত।

মতামত এবং লেখা পাঠাবার ঠিকানা

নির্বাহী সম্পাদক, আল-আমীন বার্তা, ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০ টাকা, সডাক ২০০ টাকা • **প্রতি সংখ্যা** ২৫ টাকা

দূরভাষ ০৩৩-২২২৯ ৩৭৬৯, ৭৪৭৯০ ২০০৭৬

e-mail: alameenbarta@gmail.com

weblink: www.alameenmission.org

facebook.com/alameen.barta

স্মরণ ১

সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল— দীর্ঘদিন একনিশ্বাসে উচ্চারিত হয়ে আসছে ভারতীয় সিনেমার নবজাগরণের তিন নক্ষত্রের নাম। প্রথমে ঋত্বিক ঘটক, তারপর সত্যজিৎ রায়, শেষে চলে গেলেন মৃণাল সেনও। শুধু চলচ্চিত্রেই নয়, নিজের মুক্তি খুঁজেছিলেন সামাজিক কাজকর্মেও। আল-আমীন মিশনের তিনি ছিলেন অভিভাবকতুল্য। এ-সংখ্যায় তাঁর স্মরণে তিনটি লেখা।

ধ্বস্ত স্বপ্নের ভুবন — সোমেশ্বর ভৌমিক — ৬ পাতায়

মৃণাল সেনের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার — অধৃষ্য কুমার — ১০ পাতায়

মৃণাল সেন একটি জীবন — অনিন্দ্য দত্ত — ১৬ পাতায়

স্মরণ ২

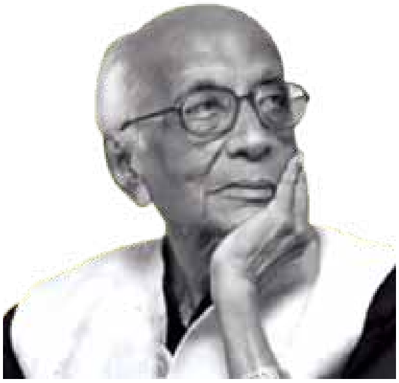

বেশিরভাগ কবি জনপ্রিয়তার ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে যান। কিন্তু, উজ্জ্বল ব্যতিক্রম কেউ কেউ থাকেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো, যাঁরা জনপ্রিয়তার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃত সৃষ্টির সীমারেখাটিকে প্রসারিত করেন বার বার। এই পাতায় তাঁর স্মরণে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পার্থজিৎ চন্দ

এক মহীরুহের ছায়া

২১ পাতায়

উজ্জ্বল প্রাক্তনী

গত তেত্রিশ বছরে আল-আমীন মিশন সমাজকে উপহার দিয়েছে বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রী। পড়াশোনায় সাফল্যের পর তাঁরা দেশে-বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ পেশায় অথবা গবেষণায় ব্যস্ত। সেইসব প্রাক্তনীদের উপস্থিতি এই বিভাগে।

এই সংখ্যায় চিকিৎসক মহম্মদ হাদীউজ্জামান

লিখেছেন আসাদুল ইসলাম

জীবন জুড়ে জীবনসংগ্রাম

২৪ পাতায়

বঙ্গদর্শন

কথায় আছে, গাঁয়ে আর মায়ে সমান। হুই যে দূরে সবুজ রেখা, ওই দিকেই গেছে রেললাইন, রাজ্য সড়ক, পঞ্চায়েতের রাস্তা। কোথাও-বা আলপথ। সব পথই গেছে কোনো-না-কোনো গাঁয়ে। কেননা, বাংলায় গ্রামই এখনও সংখ্যায় অধিক।

লিখেছেন অশোককুমার কুণ্ডু

২৮ পাতায়

প্রবাসের চিঠি, আত্মজাকে

অন্যান্য বিভাগ

পাঠকনামা	০৪
সম্পাদকীয়	০৫
পুনর্মুদ্রণ	৩২
মুক্তভাষ	৩৪
রত্ন চতুষ্টয়	৩৭
বিশ্ববিচিত্রা	৩৯
আমার বাড়ি আল-আমীন	৪১
মিশন সমাচার	৪২
সাত-পাঁচ	৫০
আমাদের পাতা	৫৬

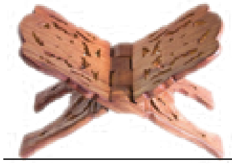

হে ঐশীগ্রন্থধারীগণ! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সঙ্গো মিশ্রিত কর এবং সত্য গোপন কর, যখন তোমরা তা জান?

— আল-কোরআন, সুরা আল-ইমরান, আয়াত ৭১

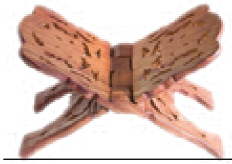

ইবনে মামউদ (রা.) বলেন, নবি করিম (সা.) বলেছেন— যে অন্যের অর্থসম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম করে, সে মহাপ্রলয়ের দিনে আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হলে তিনি তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন।

— আল-হাদিস, সহিহ্ বুখারি, হাদিস সংখ্যা ১১৪৪

নিয়মিত-অনিয়মিত

আমি বিগত দশ বছর 'আল-আমীন বার্তা'র একজন নিয়মিত পাঠক। নিয়মিত কথাটা লিখলাম নিতান্তই অভ্যাসবশত। কারণ, কোনো পত্রিকার নিয়মিত পাঠক হতে গেলে অন্ততপক্ষে সেই পত্রিকাটির নিয়মিত প্রকাশ প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত 'আল-আমীন বার্তা'কে অন্তত নিয়মিত প্রকাশিত পত্রিকা বলা কষ্টকর। এই কষ্ট আমারও। কেননা, পত্রিকাটি শুরু থেকেই পড়ছি, তাই বলতে পারি— গত ন-বছরে এই পত্রিকাটি পড়ে আমার জ্ঞানপরিধি কিছুটা হলেও বেড়েছে। অনিয়মিত প্রকাশ, তাই আমার পাঠপিপাসা বরাবরই অপূর্ণ থেকে গেছে। শুরুর দিকে এতটা অনিয়মিত ছিল না। সংখ্যাগুলিও তথ্যপূর্ণ এমন সব বিষয়ে পূর্ণ থাকত, যেমনটা অন্য বাংলা পত্র-পত্রিকায় সহজলভ্য ছিল না। আজও কি আছে? আমার জানা মতে, আজও তেমন রচনা অন্য পত্রিকায় পাই না।

জানি না, কেন পত্রিকাটির এমন ছন্নছাড়া অবস্থা। শেষ সংখ্যাটি আমাদের বোলপুরে এসেছিল গত বছর। ডিসেম্বর মাসে। এখন ২০১৯, এপ্রিলের মাঝপর্বে আছি। জানি না কবে 'আল-আমীন বার্তা'র নতুন সংখ্যা হাতে পাব।

এ-বার পাঠক হিসেবে আমার ক্ষোভের কারণগুলি জানাই।

এক— শতাধিক বছর ধরে মাঝেমধ্যেই এমন কথা আলোচিত হয়েছে এবং সেসব আলোচনাও করেছেন বিখ্যাতজনেরা যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্যে আরব ও পারস্যবাসীদের দান অপরিমেয়। কিন্তু তবু এই গূঢ় কথাটির ওপর আমরা যেন কিছুতেই আস্থা রাখতে পারি না। হয়তো-বা বিচ্ছিন্ন চর্চার জন্যেই আমাদের এই অবস্থা। অথবা ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদেরকেই আমরা গুরু বলে মেনে নিয়েছি। 'আল-আমীন বার্তা' এই কাজটি অর্থাৎ মধ্যযুগের আরব ও পারস্যের মনীষীদের জ্ঞানচর্চার পরিচিতি ও বিশ্লেষণ নানা প্রবন্ধে ধারাবাহিকভাবে করছিল। অনিয়মিত প্রকাশের জন্যে সেই ধারাবাহিকতাতেও ছেদ পড়ে।

দুই— এ ছাড়াও এমন অনেক চিত্তাকর্ষক বিষয় পত্রিকাটিতে পাওয়া যায়, যা অন্য পত্রিকায় সহজলভ্য নয়। যেমন 'বিশ্ববিচিত্রা'। যেমন 'মুক্তভাষ'। এ ছাড়াও উনিশ শতক এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলমানের জ্ঞানচর্চার পরিচয় 'আল-আমীন বার্তা'র প্রায় প্রতি সংখ্যায় পেয়ে থাকি বলে পাওয়ার আশাও দিন-দিন বেড়েছে। এই বিষয়টিও অন্য পত্র-পত্রিকায় দুর্লভ।

তিন— 'আল-আমীন বার্তা'র প্রেক্ষাপটে রয়েছে আল-আমীন মিশন। বাংলার পিছিয়ে পড়া সমাজের শিক্ষাবিস্তারে আল-আমীনের ভূমিকা আজ রাজ্যবাসী মাত্রেই জানেন। হয়তো-বা দেশের নানা প্রান্তে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির গৌরবজনক ভূমিকার কথা ছড়িয়ে পড়েছে। একজন বাঙালি হিসেবে সেই গৌরবের আমিও অংশীদার। দুঃখের কথা, ১০-১৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে দশকের পর দশক যে-প্রতিষ্ঠান আলোকবর্তিকার সন্ধান দিয়ে আসছে, সেই প্রতিষ্ঠান একটি পত্রিকা বছরে ৪-৬-টি সংখ্যা কেন প্রকাশ করতে পারে না, সেটা আমার বোধগম্যতার বাইরে। আর বুদ্ধির বাইরে বলেই আমার কষ্টও একটু বেশি।

আমি বিষয়বৈচিত্র্যে পূর্ণ এবং সুন্দর, ঝকঝকে, সুমুদ্রিত একটি পত্রিকার নিয়মিত পাঠক হতে চেয়েছিলাম। এখনও পর্যন্ত হতে পারিনি। আমার চাওয়াটা কি একটু বেশিই ছিল?

খাদেমুল ইসলাম, ভুবনডাঙা, বোলপুর

বিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান

আমাদের এক ছাত্রের কাছ থেকে 'আল-আমীন বার্তা' সংগ্রহ করে চমৎকৃত হই। বিষয়বৈচিত্র্য, উপস্থাপন, পত্রিকার সৌষ্ঠব থেকে বানান— সবই একেবারে নিখুঁত। পত্রিকায় আসাদুল ইসলামের 'রেকর্ড ভাঙো রেকর্ড গড়ো' (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৮) পড়ে সুখানুভূতির সঙ্গে কিছু কথা মনে জেগে উঠল। সেই অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ এই পত্র। মাত্র তিন দশকের এক পরিকল্পিত প্রচেষ্টায় রাজ্য ছাড়িয়ে মিশনের ছাত্র-ছাত্রীরা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ-শিক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণাগারে নিজেদের উপস্থিতি অনিবার্য করেছে। 'উজ্জ্বল প্রাক্তনী' বিভাগ সে-কারণেই অতুলনীয়। চিকিৎসাবিদ্যা ও প্রকৌশলবিদ্যার পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি কর্মস্থলেও সাফল্যের সঙ্গে তাঁদের অনেকেই দেশের উন্নয়নযজ্ঞে সামিল হয়েছেন বলেই মনে করি। রাজ্য স্তরীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স (মেডিকেল) পরীক্ষায় ধারাবাহিক সাফল্যের পর সর্বভারতীয় NEET-এ মিশনের সাফল্য নিয়ে আশঙ্কা থাকা স্বাভাবিক। সেই আশঙ্কা পুরোটা না হলেও কিছুটা সত্যি প্রমাণ করে গত ২০১৭ সালে NEET-এ মিশনের রেজাল্ট। কিন্তু পরের বছরই মিশনের ফল প্রমাণ করে প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে আল-আমীনের সাফল্য এক সুতোয় বাঁধা। এটা কম কথা নয়, ৪২৩ জন সফল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৯৫ জন ছাত্রী ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। গ্রামীণ প্রান্তিক পরিবারের প্রায় ১০০ জন তরুণী এম.বি.বি.এস. পড়বে এটা আজ থেকে মাত্র দশ বছর আগেও কেউ ভাবতে পারেননি। আনন্দের কথা— নারীদের উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি পরোক্ষভাবে নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটছে। এবং কে না জানে, সমাজের সুষম বিকাশে পুরুষদের সঙ্গে নারীদেরও অগ্রগতি জরুরি।

তবে সফলদের তালিকায় শতকরা হিসেবে প্রায় শত শতাংশই বিজ্ঞান বিভাগের পড়ুয়া। আর্টস অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানে মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্য বেশ কম। কারণ, উচ্চ-মাধ্যমিকে কলা বিভাগ থাকলেও সেটির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় না বলেই মনে হয়। ফলে এই বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীও অল্প। যে-প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা বিজ্ঞান বিভাগে এত উজ্জ্বলভাবে সফল, তার পড়ুয়ারা কলা বিভাগেও রাজ্য স্তরীয় সাফল্য পাবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাজের সব ক্ষেত্রে উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে দাঁড়াতে গেলে চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ারের পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, দার্শনিক, শিল্পী, অর্থনীতিবিদ প্রমুখও হয়ে উঠতে হবে। বিজ্ঞানের মতো সমাজবিজ্ঞানের পড়ুয়াও সমাজ, দেশ ও দশের সেবায় অনন্য হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

অদিতি মুখার্জী, পরমানন্দপুর, ময়না, পূর্ব মেদিনীপুর

শিল্পের সঙ্গে সমাজজীবনের দূরতম সম্বন্ধও যদি না থাকে, যে-সম্বন্ধে থাকে মুক্ত বন্ধন, শিল্প সার্থকতা পায় না। শিল্পীও ক্রমে ঢুকে পড়েন অন্ধ বৃত্তে অথবা এমনই অপার শূন্যে, যে-আয়তন তিনি আশা করেননি। প্রয়াত মৃণাল সেন ছিলেন এমনই এক শিল্পী, চলচ্চিত্রস্রষ্টা, যাঁর নাম একনিশ্বাসে উচ্চারিত হয় সত্যজিৎ রায় ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে। এই তিনজনকে বলা হয়— ভারতীয় সিনেমার নবজাগরণের পথিকৃৎ।

মৃণাল সেনের ছবি মানুষের অসহায়তার ছবি। ব্যক্তির এবং সমষ্টির লড়াইয়েরও ছবি। তাঁর ফিল্ম থেকে কাহিনির কোলাহল নয়, উঠে আসে আমাদের জীবনের ছোটো ছোটো অন্ধকারগুলি— যেখানে আমরা কখনো মুখ লুকোই, কখনো চিৎকার করে প্রতিবাদের অক্ষম চেষ্টা করি।

এরকম একজন সংবেদনশীল এবং শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধ মানুষ নিজের দেশের চারপাশটাকে দেখবেন না— এটা অসম্ভব। মৃণাল সেন দেখতেন। এইভাবেই এই কিংবদন্তি চিত্রপরিচালকের দৃষ্টিপথে পড়ে একটি নাম— আল-আমীন মিশন, সমাজের পিছিয়ে পড়া ছেলে-মেয়েদের আশ্রয়স্থল। তিনি আরও কাছে যান। বুঝতে চেষ্টা করেন— সমাজের কোন অন্ধকারকে মিশনটি আলোকিত করার কাজে নিয়োজিত। হয়ে যান আল-আমীনের অতি নিকটজন। আপন করে নেন দুঃস্থ মেধাবী পড়ুয়াদের। কিন্তু ওইসব দুঃস্থ, অনাথও কেউ কেউ, পড়ুয়াদের জন্যে কীই-বা তিনি করতে পারেন।

পেরেছিলেন। হয়েছিলেন সমব্যথী। হয়েছিলেন আল-আমীনের প্রেরণাদাতা। রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন তখন। তাঁর তহবিল থেকে দিয়েছিলেন ৮৮ লক্ষ টাকা।

সেই অর্থে যেসব গরিব ছেলে-মেয়ের পড়ার পথ কিছুটা মসৃণ হয়েছিল, তারা হয়তো জানতই না, কে মৃণাল সেন। আধময়লা পোশাকের যে-ছেলেটির কাঁধে হাত দিয়ে তিনি খলতপুরের ক্যাম্পাসে কোনো-একদিন হেঁটেছেন, সে-ছেলেটি জানতই না যাঁর সঙ্গে সে হাঁটছে, দুনিয়ার ডজন খানেক বিখ্যাত ফিল্মপুরস্কার তাঁর পকেটে। কিন্তু মানুষের সহজাত ক্ষমতা থেকে অন্তত এটুকু জানত— সে হাঁটছে এমন একজনের সঙ্গে, যাঁকে বিশ্বাস করে পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত যাওয়া যায়।

আমরা কৃতজ্ঞ যে, মৃণাল সেনকে পরমাত্মীয়রূপে পেয়েছিলাম। এবং আমরা বিশ্বাস করি— তিনি আজও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আর তাই অন্যান্য নিয়মিত বিভাগের সঙ্গে এ-বার তাঁর স্মরণে তিনটি লেখা 'আল-আমীন বার্তা'য় রইল।

আর রইল প্রয়াত কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর স্মরণে একটি লেখা। সমাজের সঙ্গে তাঁর বন্ধনের বড়ো উদাহরণ অতি বিখ্যাত কবিতা— 'কলকাতার যীশু' এবং 'উলঙ্গ রাজা'। তাঁর কবিতা সহজ চলনে এগিয়ে কখন যেন পৌঁছে যায় পাঠকের অন্তস্থিত জগতে এবং আলোড়িত করে, আমরা টের পাই না। মুগ্ধবিস্ময়ে বসে থাকি। এই সংখ্যায় কবিকে আমাদের স্মরণ সেই মুগ্ধতামিশ্রিত।

আল-আমীন মিশনের সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষীকে জানাই শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল— দীর্ঘদিন একনিশ্বাসে উচ্চারিত হয়ে আসছে ভারতীয় সিনেমার নবজাগরণের তিন নক্ষত্রের নাম। প্রথমে ঋত্বিক ঘটক, তারপর সত্যজিৎ রায়, শেষে চলে গেলেন মৃণাল সেনও। কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক'-এর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, "রাস্তাই একমাত্র রাস্তা।" চলচ্চিত্র 'পদাতিক'-এর সদ্যপ্রয়াত পরিচালক মৃণাল সেনের বিশ্বাস ছিল, "সিনেমার বিকল্প সিনেমাই।" শুধু চলচ্চিত্রেই নয়, নিজের মুক্তি খুঁজেছিলেন সামাজিক কাজকর্মেও। আল-আমীন মিশনের তিনি ছিলেন অভিভাবকতুল্য। এ-সংখ্যায় তাঁর স্মরণে তিনটি লেখা।

ধ্বস্ত স্বপ্নের ভুবন

সোমেশ্বর ভৌমিক

কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক'-এর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, "রাস্তাই একমাত্র রাস্তা।" চলচ্চিত্র 'পদাতিক'-এর সদ্যপ্রয়াত পরিচালক মৃণাল সেনের বিশ্বাস ছিল, "সিনেমার বিকল্প সিনেমাই।" হাতেকলমে সিনেমা তৈরির জগৎ থেকে ছুটি নিয়েছিলেন বহুদিন। কিন্তু খবর রাখতেন চলচ্চিত্রক্ষেত্রের সবকিছুর। আধুনিক সিনেমার প্রযুক্তিসর্বস্ব রূপ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, অসন্তোষ জানিয়েছেন বার বার। সেই উপলব্ধিরই প্রকাশ এই বাক্য।

তাঁর সমসাময়িক কিংবা উত্তরসূরী পরিচালকদের তৈরি কাহিনিচিত্রের আদল থেকে মৃণাল সেনের তৈরি কাহিনিচিত্রের আদল প্রথম থেকেই আলাদা। তাঁর ছবিগুলি আখ্যাননির্ভর হয়েও হয়ে ওঠেনি গতানুগতিক কাহিনিচিত্র। কথকতার আকর্ষণ বা ঘটনা বর্ণনার হাতছানিকে সযত্নে এড়িয়ে মৃণাল সেন চলে গেছেন আখ্যানের এক অন্য মহলে। সেটাকে বলা চলে, আখ্যানের অন্দরমহল। আখ্যান সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছে নানা অনিয়মিত প্যাটার্নে। নির্ভর করতে চেয়েছে চরিত্রগুলির অনুভূতির ওপর। আখ্যানের গৌরবে গরীয়ান ছিল না মৃণাল সেনের কোনো ছবিই। আখ্যান তাঁর ছবিতে কেবল উপলক্ষ। তাঁর ব্যবহৃত চরিত্রগুলিকে ধারণ করার আধার মাত্র। ছবির প্রয়োজনে সাহিত্যের দিকে যখন উনি মুখ ফেরান, তখন খুব

১৯৮২ সালের কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জুরিবৃন্দ। পৃথিবীবিখ্যাত চলচ্চিত্র-ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে রয়েছেন গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ এবং মৃণাল সেন।

বেশি কিছু দাবি থাকে না তাঁর। ছবির জন্যে সাহিত্যের কাছ থেকে উনি নিয়েছেন কিছু সামাজিক তথ্য, কোনো সামাজিক প্রক্রিয়ার আদলটুকু— সেটুকু তাঁর ছবিতে আখ্যানের কাঠামো। তারপর চিত্রনাট্যের হাত ধরে সেই সাহিত্য শুধু রূপান্তরিতই হয়নি, গোত্রান্তরও ঘটেছে তার। সেটি হয়ে উঠেছে বিভিন্ন চরিত্রের দর্পণ। এমনকী তাদের বকলমে তাঁর নিজের মানসিকতারও প্রতিফলন। আখ্যানের প্রান্তিক ভূমিকার জন্যেই তাঁর ছবিতে গুরুত্ব পেয়েছে বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত। আখ্যান নয়, তাঁর ছবিকে ঘনত্ব দিয়েছে এইসব মুহূর্তের সংগঠন এবং সেগুলির বিন্যাস। তাঁর ছবি সাহিত্যনির্ভর, কিন্তু সাহিত্য কখনোই তাঁর ছবির ভরকেন্দ্র নয়। এই অর্থে মৃণাল সেনের সিনেমা সাহিত্যনিরপেক্ষ।

আসলে মৃণাল সেন চাননি তাঁর ছবির শিল্পমূল্য আলোচিত হোক ব্যবহৃত আখ্যানের সাহিত্যমূল্যের সমান্তরালে কিংবা প্রতিতুলনায়। নিজে ছিলেন সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক। জানতেন, সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতার চেয়ে সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা কতখানি আলাদা। উচ্চমানের কোনো সাহিত্য তার প্রবল অভিঘাতে তাঁর ছবির দর্শককে আচ্ছন্ন করুক, এটা তাঁর কাম্য ছিল না।

তবে তাঁর প্রথমজীবনের ছবিতে চরিত্রগুলির ওপর আখ্যানের প্রলেপ ছিল তুলনায় পুরু। কিন্তু তখনও সিনেমার সংগঠনে কাহিনিকে অতিক্রম করে যাওয়ার একটা প্রবণতা দেখা গেছে মৃণাল সেনের কাজে। বর্জন করেছিলেন আখ্যানের সাবলীলতা, পরিপাটি কথকতার মুনশিয়ানা। আখ্যানের বাইরে অথবা ভেতরেও কী যেন খুঁজেছেন তিনি।

সেই অনুসন্ধানের অভিমুখ স্পষ্ট হল উনিশশো সত্তরের দশকে এসে। ততদিনে পরিণত হয়েছে তাঁর সিনেমার ভাষা, গভীর হয়েছে তাঁর সিনেমার দর্শন। আর তখন থেকে আখ্যানের জটিল বিন্যাস নয়, বিভিন্ন চরিত্রের অনুভব আর উপলব্ধিই হয়ে উঠল তাঁর ছবির মূল চালিকাশক্তি। এরপর তাঁর ছবিতে আখ্যান-নিরপেক্ষ কক্ষপথেই বিচরণ করেছে চরিত্রগুলি।

এভাবে সরল কাহিনি বা সুষ্ঠু আখ্যানের প্রতি এক তীব্র অনীহা নিয়েই মৃণাল সেন ধীরে ধীরে তৈরি করেছেন তাঁর নিজস্ব ঘরানা, নিজস্ব শিল্পজগৎ। সেই ঘরানার অনিবার্য উপাদান রুপোলি পর্দায় রূপের চলৎপ্রবাহ জুড়ে সোচ্চার-নিরুচ্চার নানা প্রশ্নের মিছিল। দর্শকের মনটাকে সজোরে নাড়া দেওয়ার আয়োজন। তৃতীয় ছবি 'বাইশে শ্রাবণ' থেকেই এই অভ্যাসের শুরু। ফলে সেই মানুষটার গায়ে, আর তাঁর ছবির গায়ে অনিবার্যভাবে লেপটে থেকেছে সামাজিক দায়বদ্ধতার তকমা।

কিন্তু সেই তিনিই ৬৪ বছর বয়সে পৌঁছে, খ্যাতি ও সাফল্যের মধ্যগগনে দাঁড়িয়ে, নিজের কাজ, নিজের মেজাজকে পরতে পরতে খুলে দেখাতে দেখাতে আমায় বলেছিলেন, "আমি একবার লিখেছিলাম মনে আছে, এমন একটা সময় আসবে যখন হয়তো ছবি Communicate করবে only to yourself– personal cinema, personal level-এ। আমি হয়তো সেসব জায়গায় পৌঁছোতে পারি, আমি জানি না। তবে আমি মনে করি, যদি এরকম কিছু করতে পারি, I will be happy, I wish I could do it।"

তিন দিন প্রায় বারো ঘণ্টা ধরে চলা সেই কথোপকথন সেখানেই শেষ হয়েছিল সে-দিন। কিন্তু সে-কথার রেশ আমার মনে থেকে গিয়েছিল। নানা কারণে মধ্যবর্তী তিন দশকে সেই কথোপকথনের খেই ধরা সম্ভব হয়নি। যদিও কথাবার্তা মাঝেমধ্যেই হয়েছে আর উনি জানিয়েওছেন নিজের তাৎক্ষণিক ভাবনার কথা— সিনেমা নিয়ে ভাবনা, সিনেমা করার নানা পরিকল্পনার কথা। সেইসব পরিকল্পনার অধিকাংশই পর্দা পর্যন্ত পৌঁছোয়নি। আর যতটুকু পৌঁছেছে, সেইসব কি আর আগের মতো আলোড়ন তুলেছে?

প্রশ্ন হল, শুধু এই জন্যেই কি অপ্রাসঙ্গিক, অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে সেগুলি?

আমি শুধু বলতে চাইছি, মৃণাল সেনের শেষ পাঁচটি ছবির কথা— 'জেনেসিস' (১৯৮৬), 'এক দিন অচানক' (১৯৮৯), 'মহাপৃথিবী' (১৯৯১), 'অন্তরীণ' (১৯৯৪) আর 'আমার ভুবন' (২০০২)। আমার চোখে এই ছবি পাঁচটি মৃণাল সেনের সৃষ্টিভাণ্ডারে এক বিশিষ্ট অথচ ব্যতিক্রমী গুচ্ছ।

মৃণাল সেনের আগের ছবিগুলোর মতোই এই ছবিগুলিতেও সাহিত্যের ছোঁয়া আছে[১], তাদের কাঠামোয় পাওয়া যায় আখ্যানের বুনট, আর চালিকাশক্তি হিসেবে আছে দৃশ্যমান কিছু চরিত্র— ছবি যত এগোয় তারা মেলে ধরে তাদের নিজস্ব অনুভব। কিন্তু এসব হল ছবিগুলোর বাইরের দিক। পাশাপাশি এক অদৃশ্য কিন্তু নিশ্চিত উপস্থিতি, নীরব অথচ গম্ভীর এক স্বর অন্য তাৎপর্যে মহীয়ান করে তোলে ছবিগুলিকে। আমাদের টেনে নিয়ে যায় পর্দার দৃশ্য ছাড়িয়ে গভীর নির্জন এক পৃথিবীর দিকে। সেই পৃথিবীর ভাষ্যকার স্বয়ং মৃণাল সেন। সিনেমার যেকোনো auteur-ই নিজের রুচি, মনন, বিশ্বাস আর ভাবনা চারিয়ে দেন নিজের ছবিতে। সেসব একইসঙ্গে সময়োপযোগী আবার কখনো সময়-অতিক্রমীও। কিন্তু স্রষ্টার মেজাজের একটা ছাপ ধরা থাকে তাঁদের আদ্যোপান্ত সৃষ্টিতে। ধারাবাহিকভাবে এই ছাপটা তৈরি করতে পারেন বলে তাঁরা auteur। তবে জীবনের শেষ পাঁচটি ছবিতে মৃণাল সেন শুধু নিজের ছাপটুকুই রাখেননি, নিজের স্বরকেও প্রোথিত করেছেন নিজের সৃষ্টির মধ্যে। আমরা মনে করতে পারি, জীবনের শেষ তিনটে ছবিতে (‘গণশত্রু’, ‘শাখা-প্রশাখা’ আর ‘আগন্তুক’) সত্যজিৎ রায়ও একই কাজ করেছেন। সেখানে উনি তুলে এনেছিলেন আধুনিক মানুষের জীবনের চিন্তার দৈন্য আর বিশ্বাসের সংকটের কথা। আর এই ছবিগুলোয় কোনো-না-কোনো চরিত্র পরিচালকের প্রতিনিধি হয়ে দেখা দেয়— ‘আগন্তুক’-এর মূল চরিত্রই পরিচালকের alter ego।

আখ্যানের বাইরে অথবা ভেতরেও কী যেন খুঁজেছেন তিনি।

মৃণাল সেনের শেষ পাঁচটি ছবিতে, একমাত্র কিছুটা ‘অন্তরীণ’-এ ছাড়া, এরকম কোনো প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু সারাছবি-জুড়ে প্রতিটি সিকোয়েন্সে মনোযোগী দর্শক অনুভব করবেন পরিচালকের উপস্থিতি, আর-একটু সংবেদী হলে শুনতে পাবেন তাঁর স্বর— সাম্প্রতিক পৃথিবী বিষয়ে তাঁর আশঙ্কা, দুশ্চিন্তা, উদ্‌বেগ, যন্ত্রণা আর তার মাঝেই কিছু প্রত্যাশা ধারণ করে থাকে সেই স্বর।

এই পর্বের প্রথম ছবি ‘জেনেসিস’-এর মর্মার্থ বিষয়ে একটাই কথা উচ্চারণ করেছেন মৃণাল সেন বার বার, “A World built or gained is but a world lost to be regained, to be rebuilt, Genesis over again.”। এ হল মানুষ আর প্রকৃতিকে ঘিরে ভাঙাগড়ার চক্রাকার আবর্তনের শাশ্বত সত্য। আর জীবনের শেষ ছবির অন্তে পর্দায় যখন লিখে দেন, “পৃথিবী ভাঙছে/পুড়ছে/ছিন্নভিন্ন হচ্ছে/তবু মানুষ বেঁচেবর্তে থাকে/মমত্বে/ভালোবাসায়/সহমর্মিতায়।”, তখন আর-এক সত্যে পৌঁছোবার জন্যে উদ্‌বোধিত করেন আমাদের।[২]

এরই মাঝে পৃথিবীর ভাঙা, পোড়া, ছিন্নভিন্ন হওয়ার বয়ান উঠে আসে ‘এক দিন অচানক’ আর ‘মহাপৃথিবী’ ছবিতে দুটি মানুষের হারিয়ে যাওয়ার অভিঘাতে। প্রায় এক দশক আগে তৈরি ‘খারিজ’-এর সঙ্গে একটা আপাত-সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যেতেই পারে এই দুটি ছবির। কিন্তু মন দিয়ে লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, ‘খারিজ’ ছবিতে মৃণাল সেন আখ্যানকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেন যে, এক শিশুশ্রমিকের মৃত্যুতে উন্মোচিত হয় মধ্যবিত্তশ্রেণির সংবেদনহীন স্বার্থপর অবস্থান। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এমনই করুণ সেই অবস্থান যে, প্রশ্নে প্রশ্নে তাদের বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত করে দিতে পারেন মৃণাল। অন্য ছবিদুটির ক্যানভাস অনেক ছড়ানো, অনেক বড়ো। মৃত্যু বা অনুপস্থিতি এই ছবিদুটিতে কোনো বিশেষ কার্যকারণের ফল নয়, মানুষের অস্তিত্বের সংকট থেকে উঠে আসা একটি জাগতিক অবস্থা, যার থেকে তৈরি হয় আর-এক সংকট। বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতকে ঘিরে তৈরি হলেও শেষপর্যন্ত সেটিকে অতিক্রম করেই গড়ে ওঠে ছবিদুটির বয়ান, যাকে ঘনত্ব দেয়, গাঢ় করে তোলে পরিচালকের স্বর— যে-স্বর খুব উচ্চকিত নয়, কিন্তু অস্ফুটও নয়। সেই স্বরে প্রশ্নের চেয়েও বেশি করে ফুটে ওঠে আশাভঙ্গের ব্যথা।

‘অন্তরীণ’ ছবিতেও পরিচালকের যন্ত্রণার উৎস হিসেবে উঠে আসে মানুষের অস্তিত্বের সংকট। অবশ্য মৃণাল সেনের বয়ানে এই সংকটের চেহারা-চরিত্র আলাদা। মানবিক অস্তিত্বের অপরিহার্য উপাদান মানুষে মানুষে সংযোগ। মৃণাল সেন দেখান, উত্তর-আধুনিক পৃথিবীতে সংযোগের মানবিক মাত্রাটি প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। তাঁর কথায়: “... ছবির লেখক-নায়ক এক পুরনো বিশাল প্রাসাদোপম বাড়িতে কয়েক দিনের জন্য গেছে— যদি সেই সুযোগে কিছু লেখার বিষয়বস্তু খুঁজে পাওয়া যায়। ওই পুরনো বাড়িতে যেন ক্ষুধিত পাষাণের গল্প আছে। অতীতের স্মৃতি জড়িয়ে আছে, আবার টেলিফোনও আছে বর্তমানের সঙ্গে সংযোগের। সেই টেলিফোন বাজেও গভীর রাতে, শোনা যায় এক নারীকণ্ঠস্বর। ক্ষুধিত পাষাণের কাহিনীর মতো এই নারীও অনেকটা বন্দিনী। ভেতরটা খাঁ খাঁ করে। ... লেখক অতীত বর্তমান খুঁজে একই কাহিনীর সূত্র পায়।

সেই অনুসন্ধানের অভিমুখ স্পষ্ট হল উনিশশো সত্তরের দশকে এসে। ততদিনে পরিণত হয়েছে তাঁর সিনেমার ভাষা, গভীর হয়েছে তাঁর সিনেমার দর্শন।

টেলিফোনে জানা যায়, যেন ইঙ্গিতেই বোঝা যায়, সবই সেই গভীর রাতে। দু-জনেই দু-জনকে চেনে না, জানে না, একজন বলে, অন্যজন শোনে, আবার দু-জনেই বলে চলে। এইভাবেই দু-জনের ফোনে শব্দের খেলা আর কথার খেলা চলতে চলতে একদিন শেষ হয়ে যায়। একই ট্রেনে ওঠা-নামা করে দু-জন, তবু কারও সঙ্গে মুখোমুখি কথা হয় না, চিনেও চিনতে চায় না একে অপরকে। যেন কোনো নির্দিষ্ট নারী নয়, নির্দিষ্ট লেখকও নয়। খেলা শেষ পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়। ... ”[৩]

ডান দিকে আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম, বাঁ-দিকে মিশনের দাদু ননীগোপাল চৌধুরী। মৃণাল সেনের বাসভবনে, এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে। *(ফাইল চিত্র)*

কে বলতে পারে, এখানে নিজের কথাই বললেন না মৃণাল সেন? প্রথম দেখায় ‘অন্তরীণ’-কে একটু অসংলগ্ন লাগে বটে, কিন্তু ক্রমে কুয়াশা কেটে গিয়ে পরিচালকের বক্তব্য ফুটে ওঠে আমাদের সামনে। দ্রুত একমেরুমুখী এক বিশ্বায়িত পৃথিবীর মোহময় সাংস্কৃতিক চিহ্ন আর মোহিনী লক্ষণগুলি নিয়ে তাঁর উদ্‌বেগ। এগুলো তাঁকে আড়াল থেকে ডাক দেয়, ইশারা করে চলে অবিরত। কিন্তু শেষপর্যন্ত অসমাপ্তই থাকে সংযোগ। নির্দিষ্ট কোনো মোহিনীমায়া নয়, বিশেষ কোনো শিল্পীর কথাও উঠে আসে না সংযোগহীন এই সংলাপে। অথচ দর্শকের কোনো বুঝতেই অসুবিধেই হয় না যে, ঠিক কোন সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করছেন মৃণাল সেন। অর্থনৈতিক উদারীকরণের পরবর্তী যুগের ভারতে তাঁর বহুদিনের চেনা মধ্যবিত্তশ্রেণির নতুন, ঝলমলে অথচ নিজেদের আসক্তির জালে বন্দি চেহারাটিকে আর তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। যৌবনের সূচনায় ছোটো শহর ফরিদপুর থেকে কলকাতায় এসে যে এক ধরনের পরবাসের বোধে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন তিনি, সেই বোধই যেন ফিরে এল তাঁর কাছে।

ফলস্বরূপ পরের আট বছর আর-কোনো ছবিতে হাত দেননি মৃণাল সেন। তারপর জীবনের শেষ ছবিটি যখন তৈরি করলেন, তখন তাঁর বয়স আশি বছর প্রায়। লক্ষ করার বিষয়, এ-ছবির আখ্যানক্ষেত্র নগরাঞ্চলের বদলে গ্রামাঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে— অবশ্য চরিত্রগুলি সেখানকার কৃষিজীবী মানুষের নয়, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তশ্রেণির। মৃণাল সেন এতদিনে উপলব্ধি করেছেন শহরের মানুষের চেহারাই শুধু বদলায়নি, আমূল বদলেছে তাদের মনও। মানবিকতার খোঁজে তাই হয়তো তাঁর গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ এবং নিজের চলচ্চিত্রজীবনে এই প্রথম সংখ্যালঘু পরিবেশে উঁকি মারা। খুব সহজে মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে চাননি তিনি, যদিও বুঝতে পারছিলেন, খুব বেশি ভরসার জায়গা নেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে থাকা এই পৃথিবীর আনাচেকানাচেও।

সন্দেহ নেই, এই পর্বে কেবল নিজের সঙ্গেই নিজের বোঝাপড়া, নিজের সঙ্গেই নিজের সংলাপ চালিয়ে গিয়েছেন তিনি। অন্য সকলেই সেখানে ছিলেন গৌণ।

সিনেমায় কবিতার স্বাদ আনতে চেয়েছিলেন মৃণাল সেন। ১৯৮৭ সালের যে-কথোপকথনের কথা বলেছি ওপরে, সেই কথোপকথনেরই একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে মৃণাল সেন বলেছিলেন আমায়, “শঙ্খবাবুর বইটা[৪] পড়ে আমি এখন ভাবছি— কবিতার জায়গায় পৌঁছোতে পারে ছবি, ছবিও কবিতার মর্যাদা পেতে পারে। কবিতা তো Physical reality থেকে শুরু করেই একটা concept-এ চলে যায়। আমিও সেইভাবে physical reality-টাকে পেরিয়ে এসে একটা concept-এ চলে যেতে চাই— with all my experiences about reality, with all the experiences that history has offered me— এটা হবে কবিতার ধরনে।” নানা কারণে সেই লক্ষ্য তাঁর অধরা থেকে গেছে। নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু জীবনের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি কোনোদিন, নিজের বিশ্বাস থেকেও সরে আসেননি আমৃত্যু। শুধু মেনে নিয়েছিলেন, সেই বিশ্বাস নিয়ে তর্ক করার ক্ষমতায় ভাটা পড়েছে ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে। তাই ‘আমার ভুবন’— স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে মুছে ফেলার চেষ্টা, তাই সিনেমাজীবনের শেষ উচ্চারণটুকু ধরে রাখা গভীর বিশ্বাসের প্রতীক অমোঘ কয়েকটি শব্দে। যেগুলো ঠিক কবিতা না হলেও কবিতারই মতো। ■

নির্দেশিকা

১. ‘জেনেসিস’ ছবির অবলম্বন সমরেশ বসুর একটি বড়োগল্প ‘উড়াতিয়া’, ‘এক দিন অচানক’-এর অবলম্বন রমাপদ চৌধুরীর গল্প ‘বীজ’, ‘অন্তরীণ’-এর অবলম্বন সাদাত হাসান মান্টোর গল্প ‘বাদশাহৎ কি খতমা’ আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ক্ষুধিত পাষাণ’, ‘আমার ভুবন’-এর অবলম্বন আফসার আমেদের উপন্যাস ‘ধানজ্যোৎস্না’। একমাত্র ‘মহাপৃথিবী’-র অবলম্বন ছিল অঞ্জন দত্তের অপ্রকাশিত কাহিনিসূত্র/নাটক।

২. গোর্কি সদনে মৃণাল সেনের প্রথম স্মরণসভার মঞ্চে দৃশ্যমান এই লেখাগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে পড়ে যাচ্ছিল একটি বিখ্যাত কবিতার শেষ ক-টা চরণ, “পৃথিবী হয়তো বেঁচে আছে/পৃথিবী হয়তো গেছে মরে/আমাদের কথা কে-বা জানে/আমরা ফিরেছি দোরে দোরে।/কিছুই কোথাও যদি নেই/তবু তো ক-জন আছি বাকি/আয় আরো হাতে হাত রেখে/আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।”

৩. ‘তৃতীয় ভুবন’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১।

৪. ‘কবিতার মুহূর্ত’, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ১৯৮৭।

মৃণাল সেনের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার

অধৃষ্য কুমার

মৃণাল সেন ফরিদপুর থেকে কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজ-হস্টেলে আসেন প্রায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই। ফরিদপুরের বাড়িতে আশৈশব মৃণাল সেনের মনের আদল তৈরি হওয়ার পেছনে বাবা দীনেশচন্দ্র সেনের আধুনিক সামাজিক চিন্তাভাবনার ভূমিকা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য।

মৃণালদা একেবারে ছোটোবেলার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, "আমরা সাত ভাই পাঁচ বোন। বাবা ছিলেন উকিল, আর্থিক অবস্থা মোটামুটি। স্বাধীনতার স্বপ্ন নয়, দেশজুড়ে চলছে স্বাধীনতার সংগ্রাম, দেশের মানুষের মনে তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে ঘৃণা, মানুষের হাতে বোমা। ইংরেজের বুক কাঁপিয়ে দিচ্ছে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। যত তাদের ভয় বাড়ছে, তত বাড়ছে অত্যাচার। লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন পাল এঁদের সময় তখন। বাবা তো ওকালতি করছেন, রাজনীতি করবেনটা কখন? তখন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে বাবা জড়িত ছিলেন, জড়িত ছিলেন এই অর্থে যে, ওঁদের হয়ে মামলাগুলো সব বাবাই করতেন। মামলা করতেন ঠিকই কিন্তু কাউকে বাঁচাতে পারতেন না। বাঁচাবার কোনো উপায় ছিল না। তখন দেখেছি কত অসংখ্য লোক আসতেন আমাদের বাড়িতে, আসতেন সেসব লোক, যাঁরা সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, যাঁদের পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ একদিন দুপুররাতে মাদারীপুর থেকে পূর্ণ দাস ১৫০ মাইল হেঁটে চলে এলেন। হেঁটে চলে এলেন তাঁর 'শান্তিসেনা' নিয়ে। কাজের লোক ছিল, তবু রান্না কিন্তু করতেন আমার মা। ওই মাঝরাত্তিরেই উনুন জ্বলল, সকলের জন্য মাকেই রান্না করতে হল।

স্বদেশি আন্দোলনের এই উদার অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার তথা শেকড় নিয়েই মৃণাল সেন এলেন কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে পদার্থবিদ্যায় অনার্স পড়ার জন্য। মৃণাল সেনের মেস-জীবনের শুরু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও শুরু।

এরা কিছু লোককে আশ্রয় দেয়, এটা জানতে পুলিশের খুব বেশি সময় লাগল না। ফলে আমাদের বাড়িতে ক্ষণে ক্ষণে পুলিশের তল্লাশি চলতে লাগল। কী করে মানুষ পালিয়ে বেড়ায় এটা আমি খুব ছোটোবেলা থেকেই দেখে আসছি। মানুষ ভয় পেয়ে পালায়, একজন মানুষ অনেক মানুষের জন্যই পালায়। ছোটোবেলা থেকেই আমি পুলিশ চিনেছি।

... ক্লাস থ্রিতে পড়ার সময় আমি প্রথম পুলিশের হাতে ধরা পড়ি, 'বন্দেমাতরম পুলিশের মাথা গরম' সেই সময়। থানায় ওরা অবশ্য মারধর করেনি। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমার লড়াই করার মানসিকতা তৈরি হয়েছে সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকেই। শুনতাম Charity begins at home। একদিন, মনে পড়ে, এক বন্ধুকে বলেছিলাম, Struggle begins at home। 'মুসলমান মেয়ে বিয়ে করব, দেখি না কী হয়'--- এটাও প্রায়ই বন্ধুদের বলতাম। একটা রাজনৈতিক পরিবেশে আমার বয়স বাড়ছিল, তাই শহরের যেকোনো রাজনৈতিক ঘটনাই আমাকে টানত। বরাবরই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মাথা তোলার চেষ্টা করেছি। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ আমাদের দেশের পক্ষে মারাত্মক।"

স্বদেশি আন্দোলনের এই উদার অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার তথা শেকড় নিয়েই মৃণাল সেন এলেন কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে পদার্থবিদ্যায় অনার্স পড়ার জন্য। মৃণাল সেনের মেস-জীবনের শুরু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও শুরু। মৃণালদা লিখছেন, "মেসে ডাল ভাত, কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন। ইউনিয়ন নিয়ে মেতে উঠলাম— এসএফআই। পলিটিকাল লিডাররা আসতেন। বক্তৃতা দিতেন, ক্লাস করাতেন— 'আমারি চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে'। পদার্থবিদ্যার পাশে কবিতা, কবিতার পাশে রাজনীতি, বোঝা যাচ্ছিল 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য'। কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া আর-অন্য কিছুই জানি না, আমার মাথার ওপর উত্তর কলকাতার আকাশ লাল হয়ে উঠছে, ছোটো ছোটো গোপন মিটিং, মানুষেরা মুক্তির স্বপ্ন দেখছে, তবু জানি, 'কালের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী/ যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে/ তবু জানি জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে/আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে/ ততদিন নারী ধর্ষণের ইতিহাস/ পেস্তাচেরা চোখ মেলে শেষহীন পড়া/ অন্ধকূপে স্তব্ধ ইঁদুরের মতো,/ ততদিন গর্ভের ঘুমন্ত তপোবনে/ বণিকের মানদণ্ডের পিঙ্গল প্রহার'। পদার্থবিদ্যার ছাত্র ছিলাম কিন্তু বাংলা ইংরেজি ক্লাস খুব ভালো লাগত, কত অজানা জগতের জানালা খুলে যেত, বিষণ্ন মনের ওপর আলো এসে বলত, 'এখনও অনেক রয়েছে বাকি'। ১৯৪১-এ একবার মেস থেকে গ্রেফতার হলাম। তখন কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি। বোধ হয় সাত দিন ছিলাম লালবাজারে।"

ফরিদপুরের জাতীয়তাবাদী বামপন্থায় বড়ো হওয়া মন, স্কটিশ চার্চ কলেজের মেসে এসে খুঁজে পেল বামপন্থী কমিউনিস্ট জল-হাওয়ার মুক্ত আকাশ। মৃণাল সেন হেঁটে চলেছেন বৈষম্য আর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়। কলেজে পড়াকালীনই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে সারাদুনিয়া জুড়ে ফ্যাসিস্ট নরমেধ যজ্ঞের ভয়ংকর খবর ছড়িয়ে পড়ল। নাজি হলোকাস্টের বিরুদ্ধে কলকাতা শহর রাস্তায়। ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ, গণনাট্য সংঘ, ছাত্র-যুবদের দৈনন্দিন মিছিল আর বিক্ষোভে টালমাটাল কলকাতা শহর। সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এল ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ— পঞ্চাশের মন্বন্তর। কলকাতার রাস্তায় তখন ছাত্র যুব দলের মিছিলে আওয়াজ— ফ্যাসিবাদ নিপাত যাক। মিছিলের লোকেরাই আবার দুর্ভিক্ষ ত্রাণশিবিরে খিচুড়ি রান্না আর বিলি করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুর্ভিক্ষ আর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, নৌবিদ্রোহ, রশিদ আলি দিবসের

আকাশ-বাতাস কাঁপানো কলকাতায় মিছিলের ঢেউয়ের মাথায় মাথায় তখন তরুণ মৃণাল সেন।

মৃণাল সেনের একেবারে নিজস্ব ঢঙে ধরা আছে সেই সময়টা। মৃণালদা লিখছেন, “কলেজে রাজনীতি শিখেছি, একটু-আধটু লেখাপড়াও শিখেছি। এবার একটু চাকরিবাকরি খোঁজ করতে হয়, দাদাদের সঙ্গো থাকি। চাকরি কোথায়? মন্বন্তর, দাঙ্গা, নৌবিদ্রোহ, আজাদ হিন্দ সপ্তাহ, বন্দিমুক্তির মিছিল, পোস্টাল ধর্মঘট, শ্রমিক ধর্মঘট, মিছিল, মিটিং, রক্তপাত, সারাদেশ তখন চলেছে এসবের ভেতর দিয়ে, এসবের মধ্যেই কাটছে আমাদের দিনদুপুর। তেতাল্লিশের মন্বন্তর সে একেবারে আমাদের চোখের সামনে। শহরটা চাষিদের নয়, কলকাতার রাজপথে তবু পড়ে থাকে চাষিদের মৃতদেহ। শহরের রাজপথে নির্মম ঔদাসীন্য।

... তখন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি এখনকার ওই জবাকুসুম হাউসে। একদিন সেখানে হাজির হলাম, দেখলাম চারপাশে সারি সারি বই। নতুন আর পুরোনো বইয়ের গন্ধে এক অদ্ভুত জগৎ। পড়তে শুরু করলাম। দর্শন সমাজবিজ্ঞান উপন্যাস কবিতা সবকিছু। এক সময় মার্কসিজম পড়তে শুরু করলাম। পড়ছি— পড়ছি— পড়ার ব্যাপারে বিশেষ কোনো পছন্দকে আমল দিচ্ছি না। অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিনের অভাব ছিল আমার, কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে আমি মনে করি না। কারণ, পড়ার ব্যাপারে আমার গোঁড়ামি তৈরি হয়নি।

... ’৪৬-এ প্রথম সিনেমা নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছি ‘Cinema and the people’। People ছাড়া তখন কোনোকিছুই ভাবতে পারতাম না। গীতার সঙ্গো আলাপ হল। প্রেম হল। গীতা থাকত উত্তরপাড়ায়। ওদের বাড়ি যাবার জন্য রোজই হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠতে হয়। ট্রেনে উঠি কিন্তু টিকিট কাটি না। টিকিট কাটি না এবং ধরাও পড়ি না। এখন ভাবি ধরা যে পড়িনি তার কারণ আমাদের ভালোবাসার জোর ছিল, ‘মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ আমি আছি’। একদিন ট্রেনে বসে একটা বই পড়ছিলাম। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তখন কমিউনিস্ট পার্টির একমাত্র সদস্য Galachar-এর লেখা ‘এ কেস ফর কমিউনিজম’। বালি ব্রিজের ওপর দিয়ে দু-জনে হাঁটছি। সে-দিনই প্রথম গীতার হাত ধরি। গীতার হাত ধরতে গিয়ে আমার হাত থেকে ‘এ কেস ফর কমিউনিজম’ কীভাবে যেন ছিটকে পড়ে গেল। পড়ে গেল মানে ব্রিজের ওপরে নয়, একেবারে নীচের দিকে চলে গেল, ভেসে গেল গঙ্গায় ‘এ কেস ফর কমিউনিজম’। কমিউনিজমে প্রেম নেই তা তো নয়।

... কালীঘাট ট্রাম ডিপোতে বোমা পড়েছে। সেই বোমার সঙ্গো আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিলাম, পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। নিয়ে গেল মানে কী, তিন দিন থানার লকআপে রাখল চোর গুন্ডা স্মাগলারদের সঙ্গো। তিনটে থানায় ঘোরাল। থানা থেকে আলিপুর কোর্টে নিয়ে গেল হাতে কোমরে দড়ি বেঁধে। মারধর করেনি, কিন্তু তিন দিন ধরে চলতে লাগল interrogation। কী বীভৎস সেই interrogation, এখনো সেগুলো ভাবলে শিউরে উঠি। বোমা মেরেছি কি মারিনি সেটা তো কথা নয়, ওরা আমার পকেটে কয়েক টুকরো কাগজ পেয়েছে, সেই কাগজগুলোতে আমি কিছু কোটেশন টুকে রেখেছিলাম রালফ্ ফকসের ‘Novel and the people’ আর কডওয়েলের ‘Illusion and reality’ থেকে। ...

... ১৯৫৩ সালে আমার দুরবস্থা যখন চরম অবস্থায় গিয়ে পৌঁছোয় তখন একদিন মার্চ মাসে গীতাকে বিয়ে করে ফেলি।”

চল্লিশের দশকের শেষের দিকে কমিউনিস্ট পার্টি আর কৃষকসভার নেতৃত্বে তেভাগা আন্দোলন দিনাজপুর থেকে রংপুর হয়ে দক্ষিণ বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল দেখতে দেখতে। দুর্ভিক্ষ ত্রাণশিবিরে খিচুড়ি রান্নার মাঝে গণনাট্যের গান। সঙ্গো এল বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের লড়াইয়ের সঙ্গো যুক্ত হল উদ্দাম উত্তাল সাংস্কৃতিক আন্দোলন। বাংলার সমাজে একের পর এক আছড়ে পড়ছে নতুন স্বপ্নের আর লড়াইয়ের ঢেউ। এসবের মাঝে স্বাধীনতার স্বপ্নের আকাশে দেখা দিল ছেচল্লিশের ভয়ংকর দাঙ্গার কালো মেঘ। মৃণাল সেনরা পুরো চল্লিশের দশকটাই যেন কাটিয়ে দিলেন মিছিল-সমাবেশ আর পুলিশের সঙ্গো লুকোচুরি খেলায়।

কলকাতায় হাজরা মোড়ের কাছে প্যারাডাইস ক্যাফে নামে এক চায়ের দোকানে কলকাতা শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে জড়ো হওয়া পাঁচ-সাত

পিট সিগারের সঙ্গো।

কলকাতার রাজপথে মিছিলে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সহযাত্রীদের সঙ্গে।

জনের এক আড্ডা। এই আড্ডার গল্প মৃণাল সেনের নিজস্ব বয়ানে: "আমাদের একটা ছোট্ট দল ছিল তখন। একজন ছাড়া সবাই ছিলাম বেকার, কারোরই কোনো সংসার ছিল না, মা-বাবার সংসারের দায়িত্ব এড়িয়ে চলতাম সবাই। সকাল হতেই বেরিয়ে পড়তাম। হাজরা রোডের ওপর ছোট্ট একটা চায়ের দোকানে ভিড় করতাম। আট বাই বারো ফিটের মতো একটা ছোট্ট ঘর ন্যাড়া টেবিল আর ভাঙা চেয়ারে ঠাসা দোকান, নাম প্যারাডাইস ক্যাফে, ঋত্বিক ঘটক ছিল আমাদের দলের সবচেয়ে লম্বাটে, সবচেয়ে রোগাটে, আর অবশ্যই সবচেয়ে ডাকসাইটে শরিক।

ঋত্বিক ঘটক, সলিল চৌধুরী, তাপস সেন, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায় আর আমি এই নিয়ে আমাদের দল। কখনো-কখনো বিজন ভট্টাচার্য এসেছেন আমাদের আড্ডায়, কখনো-বা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। সকাল আটটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত চলত একটানা আসর। দোকানি ঝাঁপ বন্ধ করলেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হত। আবার এসে জড়ো হতাম সূর্য ডোবার আগেই। গুচ্ছের চা গিলতাম ভাগাভাগি করে, এর ওর পকেট হাতড়ে ধার মেটাতাম, আর কথা আর বক্তৃতা, যুক্তি-তক্কো আর গল্পের ফোয়ারা। অঢেল অশেষ। ... সূর্যের তলায় যা-কিছু ছিল, সবই তুলে ধরতাম চায়ের টেবিলে, বিচারে আর বিশ্লেষণে মুখর হয়ে উঠতাম প্রতিমুহূর্তে। কিন্তু বার বার নানা কথার মধ্যেও যে-প্রশ্নে যে-তর্কে যে-বিষয়ে ফিরে আসতাম, তা হল সিনেমা সিনেমা সিনেমা আর সশস্ত্র বিপ্লব। সিনেমাকে বিপ্লবের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে আমরা চলতে শিখেছিলাম সেদিন থেকেই। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি অচঞ্চল বিশ্বাস রেখে সেদিন থেকেই আমরা অন্তঃসারশূন্য দেশজ সিনেমাকে তীব্রভাবে ঘৃণা করতে শিখেছিলাম। নতুন একটা ফ্রন্ট গড়ার জন্য মুখিয়ে উঠেছিলাম প্যারাডাইস ক্যাফের ভাঙা চেয়ার-টেবিলে ঠাসা ওই ছোট্ট ঘরে, যে-ফ্রন্টে বিপ্লব আর সিনেমা হাত ধরাধরি করে চলবে। তখন গণআন্দোলনের জোয়ারে সারাপশ্চিমবঙ্গ তোলপাড়। একদিকে সংগ্রামী জনতা কৃষক মজদুর মধ্যবিত্তের আপোশহীন লড়াই অন্যদিকে শাসকের লাঠি গুলি আর মারণযজ্ঞের নানা প্রক্রিয়া। কাকদ্বীপে লাল এলাকা তৈরি হয়েছিল সেই সময়ে। সেই সময়েই কৃষকরমণী অহল্যাকে তার পেটের বাচ্চা-সমেত খুন করেছিল দেশজ পুলিশ। এবং শহিদ অহল্যাকে স্মরণ করে ও সাধারণ মানুষের সংগ্রামী মননকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সলিল রচনা করেছিল এক মহৎ কবিতা 'শপথ'।

আমাদের ছোট্ট দলের সবাই ঠিক করলাম, আমরা পালিয়ে যাব কাকদ্বীপে। আমরা শপথ নিলাম, আমরা ছবি করব। নির্বাক ছবি। ষোলো মিলিমিটারের। তুলব লুকিয়ে লুকিয়ে। কলকাতার কোনো ল্যাবরেটরিতে সেই ছবি ধোলাই করব, সম্পাদনা করব। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে গ্রামে গ্রামে দেখিয়ে বেড়াব। আমি চিত্রনাট্য লিখলাম, সলিল নামকরণ করল 'জমির লড়াই'। ঋত্বিক ভাঙা একটা ক্যামেরা জোগাড় করল। কাকদ্বীপে অবশ্য যাওয়া হল না শেষপর্যন্ত। কিন্তু সেই সুযোগে ক্যামেরাটাকে, তা সে যতই প্রাচীন আর ভাঙা হোক-না-কেন, নাড়াচাড়া করতে পেরে ঋত্বিক ছবি তোলার কলাকৌশলের অনেকটা রপ্ত করে নিল। আমরা ঝগড়াও করেছি প্রচুর। তখন এবং পরবর্তী জীবনে। ঝগড়া করেছি, মতান্তর ঘটেছে, মনান্তর ভয়ংকর চেহারা নিয়েছে এক-এক সময়ে, আবার সময় আর ঘটনার মধ্যে দিয়ে মিশে গিয়েছি, আগেকার মতোই একসঙ্গে চলেছি।"

মৃণাল সেন বহুবার বলেছেন, "আমরা প্যারাডাইস ক্যাফের লোকেরা টালিগঞ্জ স্টুডিয়ো-পাড়ায় প্রায় গেট ক্রাশ করে ঢুকে পড়েছিলাম।" মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, তাপস সেন, সলিল চৌধুরী, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়, বংশী চন্দ্রগুপ্ত সকলেই সিনেমা নির্মাণের টুকিটাকি কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই। পূর্ণচন্দ্র যোশী (পি সি যোশী)-র প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বা নেতৃত্বে তখন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সেন্ট্রাল স্কোয়াড মুম্বাইয়ের শ্রমিক মহল্লায় রীতিমতো ক্যাম্প করে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে।

কে নেই সেখানে— কাইফি আজমি থেকে আরম্ভ করে পৃথ্বীরাজ কাপুর, রবিশঙ্কর, ভীষ্ম সাহানী, প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনা পাঠক, চিত্তপ্রসাদ, আরও অসংখ্য নাম— যাঁরা পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মাপকাঠি নির্মাণ করেছেন।

অন্যদিকে নেহরু ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের যৌথ প্রচেষ্টায় নতুন স্বাধীন ভারতবর্ষের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরু। মৃণালদা প্রায়ই বলতেন, "আমরা এই সমস্ত কিছুর সঙ্গেই প্রায় নালেঝোলে মিশেছিলাম।" এরই মাঝে আবার কলকাতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ১৯৫২ সালে। কলকাতার শিক্ষিত দর্শকদের সঙ্গে প্যারাডাইস ক্যাফের দলবলের কাছেও

মৃণাল সেন বহুবার বলেছেন, "আমরা প্যারাডাইস ক্যাফের লোকেরা টালিগঞ্জ স্টুডিয়ো-পাড়ায় প্রায় গেট ক্রাশ করে ঢুকে পড়েছিলাম।"

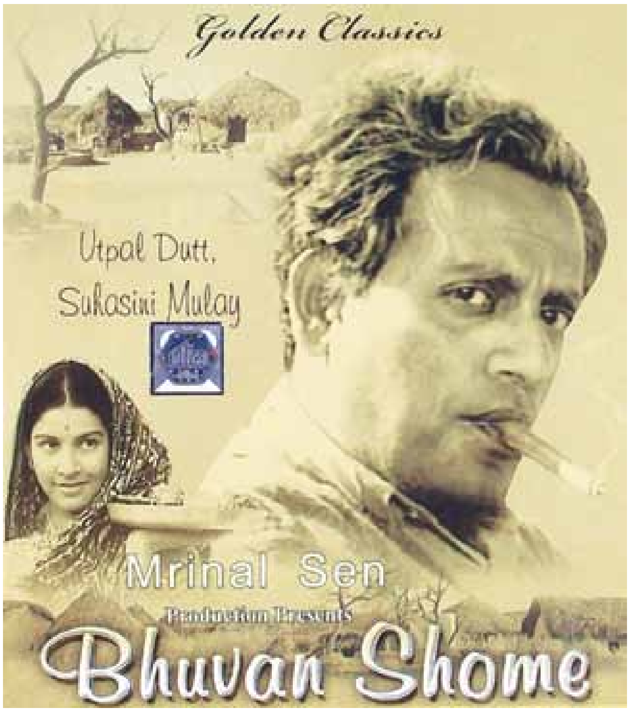

খুলে গেল দুনিয়ার চলচ্চিত্রের অদৃষ্টপূর্ব রোমাঞ্চকর জানালা।

মৃণালদার সঙ্গে এই নিবন্ধকারের প্রায় সাড়ে চার দশকের পরিচয়, আর নয়-নয় করেও তিরিশ-বত্তিরিশ বছরের অনন্ত আড্ডার স্মৃতি। মৃণাল সেন একদিকে বারে বারে ঘোষণা করেই জানিয়েছেন নস্টালজিয়ার প্যানপ্যানানি তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়, অন্যদিকে আবার তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়াকালীন উত্তর কলকাতার মেস-ছাত্রাবাস থেকে আরম্ভ করে কমলালয় স্টোর্স অথবা দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড়ের প্যারাডাইস ক্যাফের আড্ডায় বেড়ে ওঠা গড়ে ওঠা তাঁর নিজস্ব বামপন্থী সাংস্কৃতিক চেতনা-চৈতন্যের শেকড়কে সযত্নে সারাজীবন জল হাওয়া জুগিয়ে সজীব রেখেছেন। মৃণালদার কথাতেই বলতে পারি, নস্টালজিয়ার প্যানপ্যানানি পরিহার করে চৈতন্যের শেকড়ে স্থিত থাকা নিজের সঙ্গেই এক জীবনভর লড়াই।

আমি সিনেমা-বিশেষজ্ঞ নই, আমার কাছে মৃণাল সেনের নিজের সঙ্গে এই জীবনভর লড়াইয়ের চালচিত্র একইরকম আকর্ষণীয়, যেমন আকর্ষণীয় তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণের স্বকীয়তা। চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মকাণ্ড থেকে মৃণাল সেনের যাপনকে আলাদা করে দেখার কোনো যৌক্তিকতা আমার কাছে বোধগম্য নয়।

মৃণালদার নিজের ভাষায় ‘এক জঘন্য ছবি’ ‘রাতভোর’ নির্মাণের পর নিজের সম্পর্কে, নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে, কিছুটা হতাশ হয়েছিলেন বলেই সম্ভবত ওষুধ কোম্পানির ব্যাগ হাতে কানপুর যাত্রা। বছর চারেক পরে দ্বিতীয় ছবি ‘নীল আকাশের নীচে’ নিয়েও মৃণালদা যে খুব উচ্ছ্বসিত ছিলেন, তা নয়, বরং সেটাকে ভালো মাপের সিনেমা বলতে তিনি রাজি ছিলেন না মোটেই।

‘বাইশে শ্রাবণ’ নির্মাণেই মৃণাল সেন তাঁর কলেজজীবনের এবং প্যারাডাইস ক্যাফের সেই বামপন্থী শিকড়কে আবার আঁকড়ে ধরলেন, এমনটা বললে খুব-একটা অতিকথন হবে বলে মনে হয় না। সিনেমার ব্যাকরণ অথবা তার নানান ভালো-মন্দ নিয়ে আলোচনায় ঢোকার দুঃসাহস দেখাব না এই নিবন্ধে। সিনেমা নিয়ে দু-চারটে কথা ছাড়া মূলত মানুষ মৃণাল সেন এবং তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা, দৈনন্দিন জীবনে সেটা চর্চা করে যাওয়া— এই অনালোচিত অলিখিত দিকটা লিপিবদ্ধ করে রাখাটা এক অর্থে নিশ্চিত আমার ব্যক্তিগত দায়। ‘ভুবন সোম’ এবং তার পরের কলকাতা ট্রিলজি সম্পর্কে বহু আলোচনা সিনেমা-বিশেষজ্ঞরা করেছেন। আমি একটি ছবি সম্পর্কে একটি কথাই এখানে লিখে রাখতে চাই, যে-কথা হয়তো অনেকে বলেছেন এবং মৃণালদার সঙ্গে বহুবার এ নিয়ে কথা হয়েছে, ‘পদাতিকে’র সেই বহু আলোচিত বিশেষ দৃশ্য, যেখানে বিজন ভট্টাচার্য ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় সেই কয়েকটি অমোঘ বাক্যে, অসাধারণ কথোপকথনে ব্যাপৃত। বাবা আত্মগোপনকারী রাজনৈতিক কর্মী ছেলেকে যেখানে বলছেন, “আমি কিন্তু ধর্মঘট না করার কোনো মুচলেকা দিইনি।” আমার কাছে ভারতীয় চলচ্চিত্রে এর থেকে উজ্জ্বল নীতিনিষ্ঠ বামপন্থা তথা শ্রমজীবী মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ সিনেমা-দৃশ্য আর দ্বিতীয় কোনো আছে বলে মনে হয় না।

জরুরি অবস্থা-পরবর্তী সময়ে মৃণালদার সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠতা ‘বারোমাস’ পত্রিকার আড্ডায় অথবা আশিস-গোপা বর্মনের বাড়িতে, আমাদের বন্দিমুক্তি আন্দোলনের নানান প্রয়োজনে, তখন মৃণালদাকে ‘পদাতিকে’র ওই দৃশ্যের কথা বলেছি। ওই একটি দৃশ্য এবং ‘পদাতিক’ নিয়ে বহুবার কথা হয়েছে। একজন বিখ্যাত অতি বাম কবি-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী ‘পদাতিক’ নিয়ে মৃণালদাকে বলেছিলেন, এটা তো সি.আই.-এর ছবি। মৃণালদা দুঃখ পেলেও এ নিয়ে সেই বিদগ্ধ মানুষের সঙ্গে তর্কে জড়াননি।

কয়েকটি ছোটোখাটো স্মৃতি বা ঘটনা আমার মাথায় কিলবিল করছে। আমি কতগুলো ঘটনা বা স্মৃতি তুলে ধরলাম, একটাই উদ্দেশ্য, সিনেমা-করিয়ে মৃণাল সেনের চেতনায় ‘নালেঝোলে’ মেশা তাঁর বামপন্থী মনটাকে কিছুটা যাতে চেনা যায়।

মৃণাল সেন এবং তাঁর সহযোদ্ধা স্ত্রী গীতা সেন দু-জনেই তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে একদিকে যেমন বাহুল্য বর্জন করেছেন, অপরদিকে তেমনি দারিদ্র্যের প্রদর্শনেও ছিল নির্ঘাত অনীহা। বৈভব থেকে পরিমিত দূরত্ব বজায় রেখে মোটামুটি সচ্ছল জীবন যাপন করেছেন। মৃণালদার কাছে আর্থিক সাংসারিক অথবা শরীরের অসুবিধার কথা প্রায় কখনো আমি শুনিনি। সব সময় বলতেন, সব ঠিক আছে। এমনকী ২০১৪ থেকে প্রায় বছর চার-পাঁচ যখন শয্যাশায়ী, তখনও নিজের শরীরের ব্যথা যন্ত্রণার কথা ক্বচিৎ উচ্চারণ করতেন।

‘বাইশে শ্রাবণ’ নির্মাণেই মৃণাল সেন তাঁর কলেজজীবনের এবং প্যারাডাইস ক্যাফের সেই বামপন্থী শিকড়কে আবার আঁকড়ে ধরলেন, এমনটা বললে খুব-একটা অতিকথন হবে বলে মনে হয় না।

এই ব্যক্তিগত জীবনযাপনের প্রসঙ্গো বন্ধুদের সঙ্গো, বিশেষত সেই প্যারাডাইস ক্যাফের সময় থেকে যাঁরা বন্ধু, তাঁদের সঙ্গো মৃণালদার সম্পর্ক আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় আর শিক্ষণীয়ও। আমি খুব কাছ থেকে মৃণালদার সঙ্গো তাপস সেন, সলিল চৌধুরী এই দু-জনের আড্ডা কথাবার্তা দেখেছি শুনেছি বহুদিন বহুবার। সবসময়ই দৈনন্দিন নানান সমস্যায় এই দু-জনের পাশে থেকেছেন মৃণালদা। সলিল চৌধুরী যখন শেষসময়ে হাসপাতালে তখন কয়েক দিন মৃণালদার সঙ্গো আমি সেখানে গিয়েছি। ফেরার পথে কথা বলতে গিয়ে মনে হয়েছে মৃণালদা সেই কৈশোরে ফিরে গিয়েছেন। শুধু তাপস সেন সলিল চৌধুরী নন, আমার জানা আছে অনেক বামপন্থী রাজনীতির, বিভিন্ন রঙের কমবয়সি অথবা প্রবীণ মানুষও যখন বিপদে-আপদে পড়ে এসেছেন তখন মৃণালদা যথাসম্ভব সাহায্য করতে একটুও কুণ্ঠিত হননি।

মৃণাল সেনকে সাংগঠনিক দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে। ৬ অগাস্ট কমিটি থেকে ভাষা শহিদ স্মারক সমিতি বা Federation of International Film Societies -এর সভাপতির দায়িত্ব, সবই সামলেছেন অনায়াসে মুখ ব্যাজার না করে। নন্দন নির্মাণের পরিকল্পনার সময় থেকে বলা যেতে পারে, যখন ওইখানে পুকুর বুজিয়ে মাটি ফেলা হচ্ছে তখন থেকে মৃণালদা সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং আধিকারিকদের সঙ্গো দৈনন্দিন যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, সাহায্য, সহযোগিতা করেছেন।

সিনে সেন্ট্রালের অলক চন্দ্র তো প্রায় কোনো সিদ্ধান্তই নিতেন না মৃণালদার সঙ্গো পরামর্শ ছাড়া। দিনে-দুপুরে-রাতে যেকোনো সমস্যায় সিনে সেন্ট্রালের কর্মীদের আবদার মৃণালদা মিটিয়েছেন। একটা উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, সেটা কার্যকর না হওয়ায় মৃণালদা খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। অলক চন্দ্রের পরিকল্পনা ছিল একটি চলমান সিনেমা প্রদর্শনের গাড়ির ব্যবস্থা করা। মৃণালদা তখন রাষ্ট্রপতি মনোনীত রাজ্যসভার সদস্য। সাংসদের স্থানীয় উন্নয়ন তহবিল থেকে এই গাড়ির ব্যবস্থা এবং ছবি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার জন্য মৃণালদার উদ্যোগে সিনে সেন্ট্রাল, বিশেষত অলক চন্দ্র অনেকটা দূর পর্যন্ত এগিয়েছিলেন। এই কাজটা শেষপর্যন্ত কিছু আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আটকে যাওয়ায় মৃণালদা বেশ দুঃখ পেয়েছিলেন।

মৃণালদা ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্রপতি মনোনীত রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে শপথ নেন। সাংসদ মৃণাল সেন সম্পর্কে দু-চারটি কথা না বললেই নয়। মৃণালদা সবচেয়ে বেশি টাকা যে-প্রকল্পে দেওয়ার ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেন,

সাংসদ মৃণাল সেন সম্পর্কে দু-চারটি কথা না বললেই নয়। মৃণালদা সবচেয়ে বেশি টাকা যে-প্রকল্পে দেওয়ার ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেন, সেটা হাওড়ার খলতপুরে আল-আমীন মিশনের ছাত্রী-আবাস নির্মাণ প্রকল্প।

সেটা হাওড়ার খলতপুরে আল-আমীন মিশনের ছাত্রী-আবাস নির্মাণ প্রকল্প। আল-আমীন মিশন সংখ্যালঘু সমাজের দরিদ্র অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের একেবারে নীচের তলা থেকে তুলে এনে ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং-সহ উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। এ ছাড়াও বীরভূম, হুগলি, চব্বিশ পরগনা, কলকাতা-সহ বেশিরভাগ জায়গাতেই সাংসদ তহবিলের টাকায় তৈরি হয়েছে প্রাথমিক স্কুল, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র অথবা বন্যার আশ্রয়কেন্দ্র। বীরভূম জেলার লাভপুরে ঠিবা গ্রামের কাছে কোপাই নদীর ওপর সেচ-বাঁধ এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁয় গ্রামের ভেতরে রাস্তা তৈরি, নদীর ওপরে সেচের জন্যে বাঁধ তৈরি, গ্রাম থেকে মাঠে যাওয়ার জন্য ছোটো কালভার্ট তৈরি— এইসব নানান ছোটো ছোটো প্রকল্প নিয়ে যখন অনেকে আসতেন, মৃণালদা তাঁদের কাছে সব খুঁটিনাটি বিস্তারিত জানতে বুঝতে চাইতেন। এমনটা কখনোই হত না যে, স্থানীয় কোনো রাজনৈতিক নেতা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিয়েছেন আর মৃণালদা তাতে সই করে দিয়েছেন। নিজে সমস্তটা বুঝে দেখে তবেই সই করতেন, তার জন্য সময় নিতেন হয়তো বেশ কিছুদিন। সিনেমা নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখেছি বিস্তৃতভাবে সেইসমস্ত প্রকল্প পড়ে দেখতেন, বোঝার চেষ্টা করতেন। বোলপুরে গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহ অথবা কলকাতায় সায়েন্স সিটির কাছে এনার্জি এডুকেশন পার্ক বা লাভপুরে তারাশঙ্কর ভবনে প্রেক্ষাগৃহ তৈরি— সবকিছুতেই মৃণালদা খুঁটিনাটি খোঁজ নিতেন।

আমি মৃণালদাকে প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে দেখেছি বামপন্থার শেকড় তথা উত্তরাধিকারকে কখনো অস্বীকার করেননি। আবার খুব ঘোষণা করে নিজের বামপন্থা জাহির করাও ছিল মৃণালদার রুচিবোধের বিপরীত। আজকের এই গহন আঁধারে বিজন ভট্টাচার্য, মৃণাল সেন, সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, উৎপল দত্ত, তাপস সেন, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আরও অজস্র নাম, যাঁদের সাংস্কৃতিক নির্মাণকাজের উত্তরাধিকার, তাঁদের অনেকের জীবনচর্চা আমাদের দৈনন্দিন আলোচনায় জায়গা করে নিলে আখেরে আমাদেরই লাভ। আর এ-ক্ষেত্রে মৃণাল সেন অন্যতম আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। ■

[এই লেখাটি বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত ‘বাংলার আভাষ’ পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে লেখকের অনুমতি নিয়ে সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত আকারে ছাপা হল]

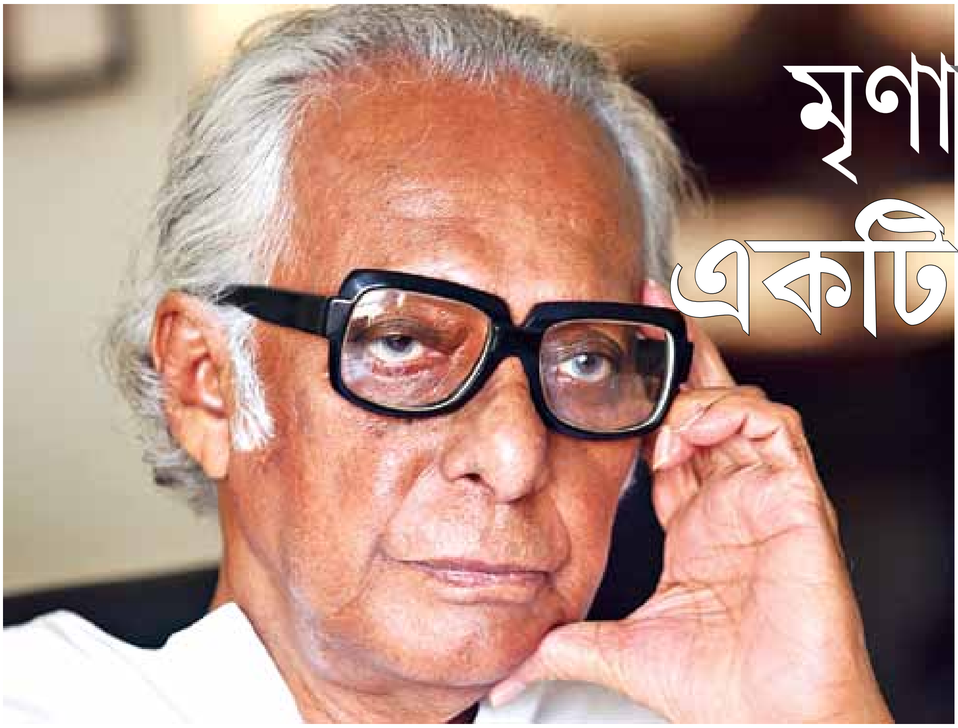

মৃণাল সেন একটি জীবন

অনিন্দ্য দত্ত

আমাদের দেশের সিনেমার ইতিহাসে যে মুষ্টিমেয় পরিচালক সিনেমাকে একটি নিছক ব্যাবসায়িক কাজ এবং অর্থ উপার্জনের উপায় হিসেবে বিবেচনা না করে, এটিকে একটি শিল্পমাধ্যমের মর্যাদা দিয়েছেন, মৃণাল সেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একজন শিল্পী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটকের কথা, বস্তুত এই তিন দিকপাল পরিচালকের হাত ধরেই ভারতীয় সিনেমা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট এক শিল্পমাধ্যমরূপে স্বীকৃত হয়েছে।

মৃণাল সেন ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে তৎকালীন ব্রিটিশভারতের পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশ) ফরিদপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। ফরিদপুরে থাকাকালীন সময়ে তিনি সেখানে উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্পন্ন করেন, এবং পরবর্তী শিক্ষার জন্য কলকাতায় এসে প্রথমে স্কটিশচার্চ কলেজে, পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। সিনেমায় শব্দগ্রহণ শিখবার জন্য তিনি একটি স্টুডিয়োতে শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগদান করেন, এবং এই বিষয়ে গভীরতর জ্ঞান লাভের জন্য তৎকালীন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি (বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার)-তে পড়াশোনা করতে থাকেন। এই লাইব্রেরিতে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে তিনি বিখ্যাত সিনেমাতাত্ত্বিক Rudolf Arnheim -এর 'Film As Art', Vladimir Nilsen-এর 'Cinema as a Graphic Art' প্রভৃতি বইয়ের সন্ধান পান, যে-বইগুলি তাঁকে প্রথম সিনেমার দর্শন ও নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন করে। মেধার সাহায্যে তিনি উপলব্ধি করেন যে, সিনেমা এক অত্যন্ত শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম, যার মাধ্যমে বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে নন্দনতাত্ত্বিক যোগসূত্র স্থাপন করা যায়।

ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সদস্যও তিনি ছিলেন, তাই সিনেমার দর্শন ও নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি পার্টির বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পত্রপত্রিকায় ব্যাপক লেখালেখি করতে থাকেন। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকার কারণে বিপ্লব-পরবর্তী সোভিয়েত চলচ্চিত্রের সঙ্গেও বিশেষভাবে পরিচিত হন। আইজেনস্টাইনের 'বাটলশিপ পোটেমকিন', পুডোভকিনের 'মাদার' দনস্কয়ের 'গোর্কি চিত্রত্রয়ী' প্রভৃতি বিখ্যাত ছবিগুলি তিনি এখানেই প্রথম দেখেন।

দুই প্রবীণ— মৃণাল সেন ও সত্যজিৎ রায়ের মাঝখানে শ্যাম বেনেগাল।

জীবিকার প্রয়োজনে টিকে থাকার কারণে তাঁকে বারে বারে বিচিত্র পেশা গ্রহণ করতে হয়েছিল। যার মধ্যে প্রেসের কর্মী, মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের কাজ ছিল।

১৯৪৭-'৪৮ সাল থেকে কলকাতায় ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন শুরু হয়। এই সংস্থার সদস্য হবার আর্থিক ক্ষমতা তাঁর না থাকলেও বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যে তিনি প্রচুর ছবি দেখতে থাকেন। সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে তখন প্রচণ্ড রাজনৈতিক উত্তাপ, কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ও বেশিরভাগ নেতারা আত্মগোপন করছেন, সেই সময় বাংলায় তেভাগা আন্দোলন চলছে, যে-আন্দোলন বামপন্থীরা পরিচালনা করছিলেন। সেই সময়, সিনেমার করণকৌশল কিছু না জেনে, শুধুমাত্র উৎসাহে ভর করে মৃণাল সেন 'জমির লড়াই' নামে একটি চিত্রনাট্য থেকে ছবি করবার চেষ্টা করেন। কোনোক্রমে একটি মুভিক্যামেরা জোগাড় করে আন্দোলনরত গ্রামে যান ও ছবি তোলার চেষ্টা করেন। যদিও তাঁর এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি—কারণ, কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকার কারণে কোনো সাংগঠনিক সাহায্য তিনি পাননি এবং পুলিশের ধরপাকড়ের ভয়ে একসময় তাঁকে চিত্রনাট্যটি পুড়িয়ে ফেলতে হয়।

ক্যামেরাই ছিল তাঁর অস্ত্র, যেটি দিয়ে ভাঙতে ভাঙতে তিনি নির্মাণ করেছেন দৃশ্য।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে নিতান্ত আকস্মিকভাবে তিনি একজন ছবি করার প্রযোজক পান, এবং তাঁর প্রথম ছবি 'রাতভোর' তৈরি করেন। যদিও তাঁর মতে ছবিটি জঘন্য হয়েছিল, কারণ, ছবি করবার করণকৌশল তখন কিছুই তাঁর আয়ত্তে ছিল না। উল্লেখ্য, এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন উত্তমকুমার, যাঁকে তখনও কেউ অভিনেতা হিসেবে চেনেন না। ছবিটি এখন সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে গেছে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও মঞ্জু দেকে নিয়ে 'নীল আকাশের নীচে' ছবিটি করেন। ছবিটিতে প্রভূত জোলো আবেগ ও অতি নাটকীয়তা থাকা সত্ত্বেও চীন-ভারত মৈত্রীর একটি জোরালো বার্তা ছিল। একজন চীনা মানুষ যে নির্ভেজাল দুশমন নয়, সেও যে একজন আবেগ উষ্ণতায় জড়ানো মানুষ—এই ছবিতে খুব দৃঢ়ভাবে সে-কথা বলা হয়েছিল। এই ছবি তাঁকে বাংলা ছবির জগতে পরিচালক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং এর পরের ছবি ১৯৬০-এ 'বাইশে শ্রাবণ' তাঁকে প্রথম আন্তর্জাতিক খ্যাতির স্বাদ এনে দেয়। পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী, মাধবী মুখোপাধ্যায়ের প্রথম ছবি এটি, মৃণালবাবুই তাঁর পিতৃদত্ত নাম মাধুরী পরিবর্তন করে তাঁর মাধবী নাম দেন। স্টুডিয়োর যথাসম্ভব বাইরে চলে গিয়ে সত্যিকারের লোকেশনে শুটিং করা 'নব্য বাস্তবতা' ধারার ছবি এটি। এই ছবি থেকেই মৃণাল সেনের ছবির ভাষায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিল। এরপর তিনি ১৯৬১-তে 'পুনশ্চ', ১৯৬৩-তে 'অবশেষে', ১৯৬৪-তে 'প্রতিনিধি' এবং ১৯৬৫-তে 'আকাশ কুসুম' ছবিগুলি তৈরি করেছিলেন। এই ছবিগুলির মধ্যে একমাত্র 'আকাশ কুসুম' ছাড়া অন্যগুলি কোনো কারণেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। 'আকাশ কুসুম' ছবিতে মৃণাল সেন প্রথম আঙ্গিক ও চিত্রভাষা নিয়ে ভালোরকম পরীক্ষানিরীক্ষা করলেন। এই সময় ইয়োরোপে, বিশেষভাবে ফ্রান্সে 'নব্যতরঙ্গ' (New Wave) আন্দোলন চলছে। চলচ্চিত্রকার ত্রুফো এবং বিশেষভাবে জাঁ-লুক গোদার প্রচলিত চিত্রভাষাকে সমূলে ভেঙেচুরে সিনেমায় এক নতুন আঙ্গিকগত বিপ্লব এনেছেন। পুরোনো গল্প বলার ঢং সম্পূর্ণ চুরমার হয়ে গেছে, গড়ে উঠেছে এক নতুনতর চিত্রভাষা, সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে যার কোনো মিল নেই, নেই কোনো ঋণ। এই 'নব্যতরঙ্গে'র, বিশেষভাবে গোদারের ছবি মৃণাল সেনের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফল কী হয়েছিল, তার বিশ্লেষণে না গিয়েও এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আমাদের দেশে মৃণাল সেনই তাঁর ছবিতে এই আঙ্গিকগত ভাঙাগড়ার কাজ প্রথম শুরু করেন। সত্যজিৎ রায় যেমন ভারতীয় আধুনিক সিনেমার পথিকৃৎ, ঠিক সেভাবেই মৃণাল সেন ভারতীয় সিনেমার পরীক্ষামূলক পথের পথিকৃৎ, এ-কথা সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায়। তাঁর ওই পরীক্ষানিরীক্ষা যদিও তৎকালে এবং পরবর্তীকালে প্রচুর বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল, তবু তাঁর ছবিতেই যে আঙ্গিক বিপ্লবের প্রথম স্বাক্ষর দেখা যায়, তা

ভারত সরকারের ফিল্ম ফিনান্স করপোরেশনের আর্থিক সহায়তায় তিনি বনফুলের বিখ্যাত গল্প 'ভুবন সোম' থেকে ওই একই নামের একটি ছবি তৈরি করেন। এটি তাঁর প্রথম হিন্দি ছবি। 'ভুবন সোম' ভারতের হিন্দি ছবির জগতে সম্পূর্ণ নতুন এক রীতির জন্ম দেয়। হিন্দি ছবির ইতিহাসে 'ভুবন সোম' এক বিরাট ব্যতিক্রম।

১৯৯৪ সালে আল-আমীন মিশনের সংবর্ধনা সভায় রবীন্দ্রসদনে ছাত্রদের সঙ্গো মৃণাল সেন।

অনস্বীকার্য। এই সময়ে তিনি আরেকটি নতুন ধরনের কাজ করেন, বাঙালি পরিচালক হয়েও ওড়িয়া ভাষায় ওড়িয়া সাহিত্যিক কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর কাহিনি থেকে 'মাটির মনীষ' ছবিটি করেন, যে-ছবি ওড়িয়া কাহিনিচিত্রের ইতিহাসে নবদিগন্তের সূচনা করে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ নিয়ে এল মৃণাল সেনের প্রথম বড়ো সাফল্য, সেই বছর ভারত সরকারের ফিল্ম ফিনান্স করপোরেশনের আর্থিক সহায়তায় তিনি সাহিত্যিক বনফুলের বিখ্যাত গল্প 'ভুবন সোম' থেকে ওই একই নামের একটি ছবি তৈরি করেন। এটি তাঁর প্রথম হিন্দি ছবি। 'ভুবন সোম' ভারতের হিন্দি ছবির জগতে সম্পূর্ণ নতুন এক রীতির জন্ম দেয়। ব্যাবসায়িক ভিত্তিতে চলা মানোরঞ্জনের ফর্মুলাভিত্তিক হিন্দি ছবির ইতিহাসে 'ভুবন সোম' এক বিরাট ব্যতিক্রম। হিন্দি ছবিতেও যে তথাকথিত নায়ক-নায়িকা, মারদাঙ্গা, অতি অভিনয়, চোখধাঁধানো দৃশ্যপট এবং চড়া সুরের গল্পের বদলে মানবিক টানাপোড়েন এবং মানবিক সমস্যা ও সাধারণ জীবনের কাহিনি সার্থকভাবে দেখানো যায়, 'ভুবন সোম' তার প্রথম দৃষ্টান্ত। নামভূমিকায় উৎপল দত্ত অসামান্য অভিনয় করেন। মুগ্ধ করেন নবাগতা সুহাসিনী মুলে ও সাধু মেহের। প্রায় সম্পূর্ণ আউটডোরে প্রকৃতিকে একটি চরিত্র হিসেবে ব্যবহার করে, কাহিনির অন্তস্তলের কৌতুককে এক অসাধারণ উচ্চতায় নিয়ে যাবার দৃষ্টান্ত হিসেবে এই ছবি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এই ছবির ব্যাবসায়িক সাফল্যের পর ফিল্ম ফিনান্স করপোরেশন তাঁদের নীতির পরিবর্তন করেন, শুধুমাত্র ভালো ছবি করার প্রচেষ্টা আছে, অথচ আর্থিক সামর্থ্য নেই, এমন পরিচালকদেরই অর্থ সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে পরবর্তীকালে বহু নতুন পরিচালক নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন এবং ভারতীয় সিনেমার প্রভূত উন্নতি হয়েছিল।

এরপর মৃণাল সেনের ছবিতে এক নতুন দিশা দেখা দেয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের 'ইন্টারভিউ', ১৯৭২-এর 'কলকাতা ৭১', ১৯৭৩-এর 'পদাতিক'— এই তিনটি ছবির মাধ্যমে মৃণাল সেন প্রথম সরাসরি রাজনীতিকে ভারতীয় ছবির বিষয় হিসেবে আনেন। যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে ১৯৭৪ সালে নির্মিত 'কোরাসে'র মাধ্যমে— এই চারটি ছবিই তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ ও অনেকাংশে ভারতের উত্তপ্ত রাজনৈতিক অবস্থার দলিলচিত্ররূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। মার্কসবাদী রাজনীতি ও বামপন্থী কার্যকলাপ এই প্রথম বাংলার দর্শক সুস্পষ্টভাবে ছবিতে দেখতে পেলেন। সমকালীন রাজনীতির প্রত্যক্ষপ্রভাবে চমকে উঠলেন দর্শক। এই চারটি ছবিতেই মৃণাল সেন সিনেমার ভাষা ও আঙ্গিক নিয়ে যথেচ্ছ পরীক্ষা করলেন, এমনকী, এইগুলিতে চলচ্চিত্রভাষা অনেক ক্ষেত্রে কাহিনিচিত্রের বুনোটকে অস্বীকার করে প্রায় তথ্যচিত্রের আঙ্গিক হিসেবে ফুটে উঠল। এমন দৃশ্য দর্শক দেখতে পেলেন, যেখানে নায়ক বা প্রধান চরিত্র কোনো বাসে উঠছেন, পেছনে পেছনে ক্যামেরা ও শব্দযন্ত্র নিয়ে ধাওয়া করেছেন পরিচালক ('ইন্টারভিউ'), মিছিল করা শ্রমিকদের সঙ্গো মিলিত হচ্ছেন কৃষকরা। প্রকাশ্যে আওয়াজ উঠছে 'শ্রমিক-কৃষক ভাই ভাই' ('কোরাস') বা পুলিশের হাতে খুন হওয়া যুবক সরাসরি দর্শকের সঙ্গো কথা বলে, তাদের খুঁজে বের করতে বলছে তার ঘাতকদের ('কলকাতা ৭১')। কলকাতা শহরকে শুধুমাত্র এক ইট-সিমেন্টের শহর না দেখিয়ে, তাকে বিশিষ্ট চরিত্ররূপে উপস্থিত করেন পরিচালক। বাস্তবতার মধ্যেও যে শুধুমাত্র চোখে দেখা সত্য ছাড়াও আরও নানা স্তর আছে— যেমন পরাবাস্তবতা বা অধিবাস্তবতা এবং বক্তব্য প্রকাশের প্রয়োজনে কাহিনি বিন্যাসের মধ্যে এগুলি নানা

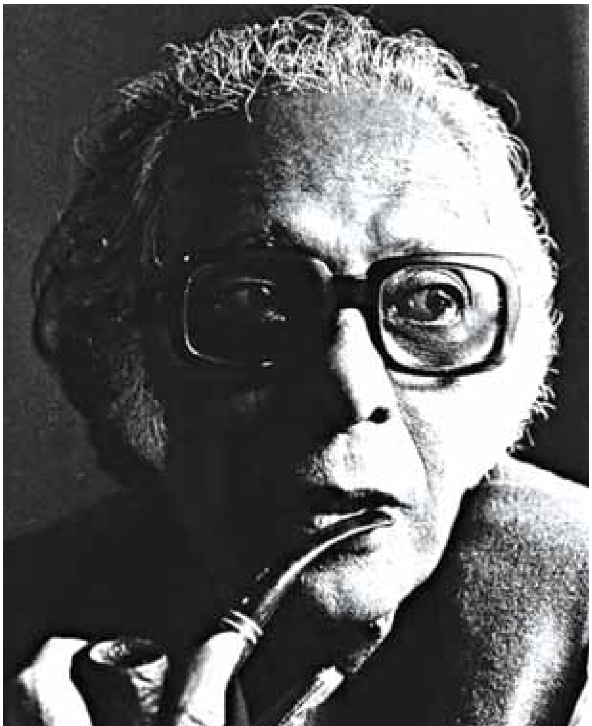

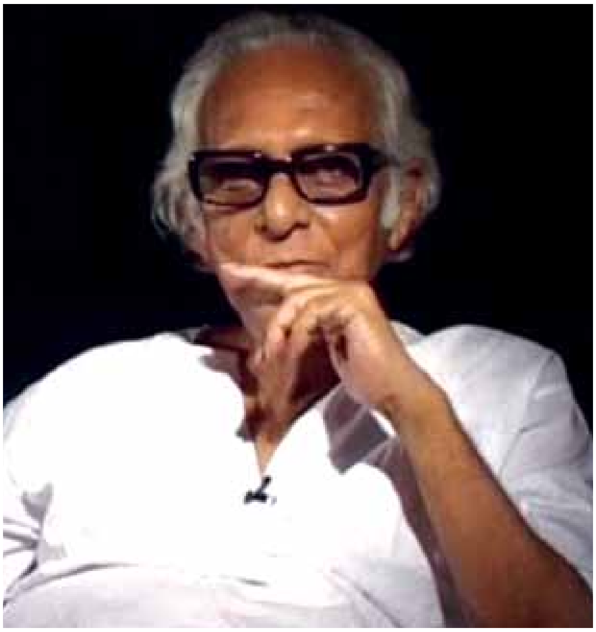

মাত্রায় ক্রিয়া করে অনেক আপাত অদ্ভুত ঘটনা সংগঠন করে, দর্শকের বোধে ও মননে অনেক আপাত অলীক দৃশ্যের সৃষ্টি করে, যার অন্তরালে থাকে নিগূঢ় প্রতীকায়িত অর্থ, সিনেমার ভাষার এই আন্তর্জাতিক ব্যবহার তাঁর ছবিতে খুব স্পষ্টভাবে দেখা গেল। বিশেষভাবে ‘কোরাস’ ছবিতে, যেখানে পুরো ঘটনাটি বুনে তোলা হয়েছে এক Absurd আঙ্গিকে। উল্লেখ্য, এই ছবির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন বাংলাভাষার প্রথম Absurd নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়।

১৯৭১ সালে তিনি সুবোধ ঘোষের ‘গোত্রান্তর’ গল্প থেকে ‘এক আধুরী কাহানী’ নামে একটি ছবি বানিয়েছিলেন। এই ছবিতেও তিনি হিন্দি ছবিতে প্রথম সরাসরি মার্কসবাদী রাজনীতিকে ব্যবহার করলেন।

১৯৭৬ সালে তিনি তাঁর অন্যতম ব্যাবসায়িকভাবে সফল হিন্দি ছবি ‘মৃগয়া’ বানান। মিঠুন চক্রবর্তী এবং মমতাশঙ্করের প্রথম ছবি ‘মৃগয়া’। এটি তাঁর প্রথম রঙিন ছবিও বটে। ছবিতে আদিবাসী শ্রেণির বিদ্রোহকে পটভূমিকা হিসেবে ব্যবহার করে তিনি সমকালীন রাজনীতি ও বিচার ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেন। প্রেমচন্দের বিখ্যাত ‘কাফন’ কাহিনি অবলম্বনে ১৯৭৭ সালে বানান ‘ওকা উরি কথা’। কোনো বাঙালি পরিচালকের তেলুগু ভাষায় ছবি বানানোর এটিই প্রথম দৃষ্টান্ত।

১৯৭৮-’৭৯ থেকে আবার দিশা পরিবর্তন করলেন মৃণাল সেন। ১৯৭৮-এর ‘পরশুরাম’, ১৯৭৯-র ‘একদিন প্রতিদিন’, ১৯৮০-র ‘আকালের সন্ধানে’, ১৯৮১-তে ‘চালচিত্র’, ১৯৮২-র ‘খারিজ’ এবং ১৯৮৩-র ‘খণ্ডহর’-এ আমরা আবার এক নতুন স্রষ্টাকে প্রত্যক্ষ করলাম। এর সঙ্গে ১৯৮৯-এর ‘এক দিন অচানক’, ১৯৯১-এর ‘মহাপৃথিবী’ ও ১৯৯৩-এর ‘অন্তরীণ’-কে বোধ হয় গণ্য করা উচিত। এ এক সম্পূর্ণ নতুন অভিমুখ এই বিরাট প্রতিভার, যেখানে তিনি বলতে চাইলেন— বাইরের পুঁজিবাদী সমাজে ধনিক শ্রেণি এবং শোষক শক্তি খুবই শক্তিশালী এবং প্রধান শত্রু নিশ্চয়। কিন্তু মধ্যবিত্তের ভয়াবহ স্ববিরোধ, মূল্যবোধের ক্ষয়, সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি, ভেতরে ভেতরে যা আমাদের বিনষ্ট করে চলেছে— সেও কম শক্তিশালী শত্রু নয়— আমাদের ভণিতাসর্বস্বতা, কাপুরুষতা ও স্বার্থপরতা আমাদের আত্মহননের পথে নিয়ে চলেছে। নিজেরাই আমরা স্বশ্রেণির চরম শত্রু হয়ে উঠছি। সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠছি শাসক শ্রেণির দালাল এবং আজ্ঞাবহ— মধ্যবিত্তের এই শোচনীয় পতনের পরিচালক মৃণাল সেন তীব্র সমালোচক। এই ছবিগুলি, তাঁর আগের পর্বের ছবিগুলির মতো সোচ্চার নয়, এগুলিতে তিনি দর্শকের সঙ্গে যেন এক তাত্ত্বিক আলোচনা উত্থাপন করেছেন— যেন বলতে চেয়েছেন, দর্শক যেন নিজের দিকে তাকান, আত্ম-উপলব্ধি করেন— বলতে চেয়েছেন, শিল্পীও তাঁর শিল্পের ক্ষেত্রে শেষকথা বলবার লোক নন। তিনি কোনো বাণী দিচ্ছেন না। তিনি নিজের সৃষ্টির ঈশ্বর নন, তিনি শুধু ক্ষত চিহ্নিত করছেন, যাতে দর্শকের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই একটি সুস্থ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। একটি ছবির বিভিন্ন অভিঘাত ও পরিণামের প্রতিক্রিয়া দর্শক ও শিল্পী যৌথভাবে সৃজন করতে পারেন। সেই বিতর্ক একটি মেয়ের রাত্তিরে বাড়ি না ফিরতে পারার প্রতিক্রিয়াই হোক (‘একদিন প্রতিদিন’) কি এক ছবি করিয়ে দলের ১৯৪২-এর দুর্ভিক্ষের ওপর একটি সত্যনিষ্ঠ ছবি তৈরির ব্যর্থতাই হোক (‘আকালের সন্ধানে’) বা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও জার্মানির দেয়াল ভেঙে পড়ার মাধ্যমে উদ্ভূত বিশ্বসমাজতন্ত্রের সংকটের প্রতিক্রিয়া (‘মহাপৃথিবী’)— যাই হোক-না-কেন। শিল্পের কোনো আপ্তবাক্য নেই, বৈচিত্র্যেই তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ— এই অভিধা ভারতীয় সিনেমায় মৃণাল সেনের ছবিতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

১৯৮৬-তে তিনি করেন ‘জেনেসিস’, যা একইসঙ্গে হিন্দি, ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় নির্মিত হয়েছিল। এই ছবিতে পরিচালক ফিরে যাবার চেষ্টা করেছেন মানবসভ্যতার উষালগ্নে, যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ও আধিপত্যের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয়ে সহজ বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাকে আঘাত করল। মহাকাব্যিক এই ছবির ব্যঞ্জনা। ২০০২ সালে তিনি তাঁর শেষ ছবি ‘আমার ভুবন’ তৈরি করেন। এ যেন ‘জেনেসিস’-এর বক্তব্যকেই ভোগবাদী পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে দেখা। এরপর তিনি দীর্ঘ ষোলো বছর শয্যাশায়ী ছিলেন— ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮-তে কলকাতার ভবানীপুরে ৯৫ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়।

ভারতীয় ছবিতে মৃণাল সেন একটি সত্য— “সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবেসেছিলাম, সে কখনো করে না বঞ্চনা।” এই মানুষটিও জীবনে কখনো যশ, অর্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে নিজের আদর্শচ্যুত হননি। তাঁর দর্শককে বঞ্চিত করেননি।

১৯৮৬-তে তিনি করেন ‘জেনেসিস’, যা একইসঙ্গে হিন্দি, ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় নির্মিত হয়েছিল। এই ছবিতে পরিচালক ফিরে যাবার চেষ্টা করেছেন মানবসভ্যতার উষালগ্নে, যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ও আধিপত্যের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয়ে সহজ বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাকে আঘাত করল।

মৃণাল সেনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং সম্মান

সম্মান

১৯৭৯: নেহরু সোভিয়েত ল্যান্ড সম্মান।
১৯৮১: ভারত সরকারের পদ্মভূষণ।
১৯৮৫: ফরাসি প্রেসিডেন্ট মিতেরো প্রদত্ত Commandeur de ordre des Arts et des letters (সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান)।
১৯৯৩: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.লিট.।
১৯৯৬: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.লিট.।
১৯৯৯: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.লিট.।
১৯৯৮-২০০৩: রাজ্যসভার সাম্মানিক সদস্য।
২০০০: রাশিয়ান ফেডারেশনের Order of Friendship।
২০০৫: দাদাসাহেব ফালকে সম্মান।
২০০৯: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.লিট.।
২০১৭: অস্কার একাডেমির সদস্যপদ।

পুরস্কার

ভারতে

শ্রেষ্ঠ কাহিনিচিত্রের জাতীয় পুরস্কার
১৯৬৯: ভুবন সোম
১৯৭৪: কোরাস
১৯৭৬: মৃগয়া
১৯৮০: আকালের সন্ধানে

দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কাহিনিচিত্রের জাতীয় পুরস্কার
১৯৭২: কলকাতা ৭১
১৯৮২: খারিজ

শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবির জাতীয় পুরস্কার
১৯৬১: পুনশ্চ
১৯৬৫: আকাশ কুসুম
১৯৯৩: অন্তরীণ

শ্রেষ্ঠ তেলুগু ছবির জাতীয় পুরস্কার
১৯৭৭: ওকা উরি কথা

জাতীয় পুরস্কার (বিশেষ গুরুত্ব)
১৯৭৮: পরশুরাম

শ্রেষ্ঠ পরিচালকের জাতীয় পুরস্কার
১৯৬৯: ভুবন সোম
১৯৭৯: একদিন প্রতিদিন
১৯৮০: আকালের সন্ধানে
১৯৮৪: খণ্ডহর

শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যের জাতীয় পুরস্কার
১৯৭৪: পদাতিক
১৯৮০: আকালের সন্ধানে
১৯৮৪: খারিজ

ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার
(সমালোচকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ ছবি)
১৯৭৬: মৃগয়া

(শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য)
১৯৮৪: খণ্ডহর

(শ্রেষ্ঠ পরিচালক: বাংলা)
১৯৮২: আকালের সন্ধানে

ফিল্ম ফেয়ার সারাজীবনের শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার ২০১৭, বাংলা ছবি।

বিদেশে

মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (রৌপ্য পদক)
১৯৭৫: কোরাস
১৯৭৯: পরশুরাম

কারলোভিভারি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (বিশেষ জুরি পুরস্কার)
১৯৭৭: ওকা উরি কথা

বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব
(ইনটার ফিল্ম পুরস্কার)
১৯৭৯: পরশুরাম
১৯৮১: আকালের সন্ধানে

(গ্রান্ড জুরি পুরস্কার)
১৯৮১: আকালের সন্ধানে

কান চলচ্চিত্র উৎসব
(জুরি পুরস্কার)
১৯৮৩: খারিজ

ভ্যালাডোলিড আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব
(সুবর্ণ স্পাইক)
১৯৮৩: খারিজ

শিকাগো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব
(গোলডেন হুগো)
১৯৮৪: খণ্ডহর

মন্ট্রিয়ল বিশ্ব চলচ্চিত্র উৎসব
(জুরিদের বিশেষ পুরস্কার)
১৯৮৪: খণ্ডহর

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব
(OCIC পুরস্কার)
১৯৮৯: একদিন অচানক

কায়রো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব
(শ্রেষ্ঠ পরিচালকের রৌপ্য পিরামিড)
২০০২: আমার ভুবন ■

বেশিরভাগ কবি জনপ্রিয়তার ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে যান। কিন্তু, উজ্জ্বল ব্যতিক্রম কেউ কেউ থাকেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো, যাঁরা জনপ্রিয়তার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃত সৃষ্টির সীমারেখাটিকে প্রসারিত করেন বার বার। এই পাতায় তাঁর স্মরণে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
এক মহীরুহের ছায়া

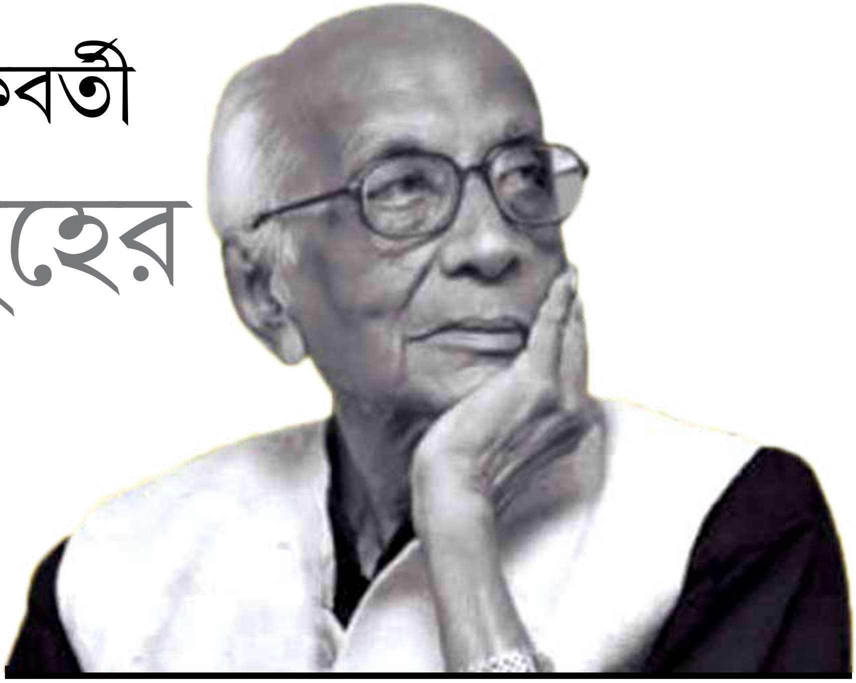

পার্থজিৎ চন্দ

জনপ্রিয়তার বেশ কিছু শর্ত থাকে, বেশিরভাগ সাহিত্যিক সেই শর্তের ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে যান। কিন্তু, উজ্জ্বল ব্যতিক্রম কেউ কেউ থাকেন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো যাঁরা বার বার জনপ্রিয়তার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃত সৃষ্টির সীমারেখাটিকে প্রসারিত করেন বার বার।

খুব অল্প কয়েক জনই থাকেন নীরেন্দ্রনাথের মতো, যাঁরা কবিতার শরীরে গোপন করে রাখতে পারেন সু-উচ্চ দর্শনের বীজ। তাঁদের কবিতা পড়তে গিয়ে বার বার মনে পড়ে যায় নন্দলাল বসুর সেই বিখ্যাত পর্যবেক্ষণ— প্রকৃত শিল্প হল গাছ থেকে উড়ে যাওয়া পাখিটির মতো। পাখিটি উড়ে গেল, কিন্তু সে তার গমনপথের কোনো চিহ্ন রেখে গেল না। নীরেন্দ্রনাথ সেই বিরল কবি, যাঁকে পাঠ করতে গিয়ে পাঠককে যুগপৎ আশ্রয় নিতে হয় নিজের মেধা ও আবেগের কাছে। তিনি শুধু মেধার নন, আবার শুধুই আবেগের নন। এই দুইয়ের এক অভিজাত ও বিরল যুগলবন্দির নাম নীরেন্দ্রনাথ।

নীরেন্দ্রনাথের কবিতা আসলে জীবনের সহজ গান। এ-ক্ষেত্রে 'সহজ' শব্দটির দিকেই বেশি ধ্যান দিতে হবে। তাঁর কবিতার স্বচ্ছ ও সাবলীল বিন্যাস তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে পাঠকপ্রিয়তার উত্তুঙ্গ শিখরে। কথ্যভাষার চলনটিকে তিনি কবিতার শরীরে নিয়ে এসেছেন। উচ্চারণের এই ধারাটি বাংলা কবিতার এক অনন্য সম্পদ। কিছু কবি থাকেন, যাঁরা নিজেদের প্রভাব দিয়ে ভাষার ভবিষ্যৎ গতিপথটিকে নির্দিষ্ট করে যান। এর সব থেকে বড়ো উদাহরণ জীবনানন্দ দাশ। জীবনানন্দের পর বাংলাভাষার তরুণতর কবিরা সব থেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন সম্ভবত নীরেন্দ্রনাথের অক্ষরবৃত্তের চলনের দ্বারাই। তিনি নিজে সেই জাদুকর, যিনি কথনের এক বিশেষ জাদুতে দশকের পর দশকের কবিদের আচ্ছন্ন করে রেখেছেন।

নীরেন্দ্রনাথের দর্শনের জগৎটিকে আচ্ছন্ন করে আছে লৌকিক দর্শনের বিশাল ও গভীর ব্যাপ্তি। নিছক চেতনকারণবাদের দিকে কোনোদিনই ঝুঁকে থাকেননি তিনি। তিনি ঝুঁকে পড়েননি কবিতাকে দর্শনের ভারে ভারাক্রান্ত করবার প্রাণান্তকর চেষ্টার দিকেও।

কবিজীবনের একদম প্রথমদিকে একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন:

> জীবন যখন রৌদ্র-ঝলোমল,
> উচ্চকিত হাসির জের টেনে,
> অনেক ভালবাসার কথা জেনে
> সারাটা দিন দুরন্ত উচ্ছল
> নেশার ঘোর কাটল। সব আশা
> রাত্রি এলেই আবার কেড়ে নিয়ো,
> অন্ধকারে দু-চোখ ভরে দিয়ো
> আর কিছু নয়, আলোর ভালবাসা। ('শেষ প্রার্থনা')

— এই কবিতাটি, আরও অজস্র কবিতার মতোই, তাঁর বোধের জগৎটিকে চিহ্নিত করবার পক্ষে সবিশেষ সহায়ক হতে পারে। অমৃতের পুত্রকন্যাদের আলোর প্রতি যে-অভিসার, যে শুদ্ধতম জগতের দিকে আমাদের অভিযাত্রা, সেই পথটিতেই আজীবন থিতু থাকতে চেয়েছেন

রাজভবনে এক অনুষ্ঠানে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের হাত থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পুরস্কার নিচ্ছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

তিনি। একদম প্রথম থেকে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, এটাই তাঁর পথ। এই-ই তাঁর দর্শন।

বাংলা কবিতাকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সব থেকে বেশি কথ্যরূপের কাছাকাছি এনেছেন। গদ্য ও কবিতার মাঝখানে শুয়ে থাকা যে অদৃশ্য সীমারেখা, সেটিকে ভেঙে দেওয়া, একটা সিনট্যাক্সকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নামান্তর। নীরেন্দ্রনাথ এই কাজটি অত্যন্ত সার্থকভাবে করেছেন।

নীরেন্দ্রনাথের জগৎ 'ময়-দানবে'র জগৎ নয়। তিনি সনাতন কুম্ভকারের মতো, হাতের কাছে পড়ে থাকা মাটিটুকু দিয়ে তৈরি করেন নিজের জগৎ। নরম মাটির বুকে বসে যায় তাঁর হাতের ছাপ। অব্যর্থ, সেই যেমন তাঁর 'নিজের বাড়ি', এক বিখ্যাত কবিতা। কবিতাটি শুরু হচ্ছে:

> ভাবতে ভাল লেগেছিল, এই ঘর, ওই শান্ত উঠোন,
> এই খেত, ওই মস্ত খামার—
> সবই আমার।
> এবং আমি ইচ্ছে হলেই পারি
> ইচ্ছেমতন জানলা-দরজা খুলতে
> ইচ্ছেমতন সাজিয়ে তুলতে
> শান্ত সুখী একান্ত এই বাড়ি

— যেন মুখের কথাকে কেউ কেড়ে নিয়ে কবিতায় বসিয়ে দিয়েছেন। এবার দেখা যাক কবিতাটি শেষ হচ্ছে কীভাবে:

> ভাবতে ভাল লেগেছিল, কাউকে কিছু না জানিয়ে
> হঠাৎ কোথাও চলে যাব।
> ফিরে এসে আবার যেন দেখতে পারি,
> যে-নদী বয় অন্ধকারে, তারই বুকের কাছে
> বাড়িটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।
> ওই যে বাড়ি, ওই তো আমার বাড়ি।

— 'আমার' মধ্যেই এই জগতের সব লীলা ও রঙের প্রবাহ। বয়ে চলেছে অফুরান। এর কোনো বিলয় নেই, ক্ষয় নেই। উপনিষদ থেকে রবীন্দ্রনাথ— এক বৃহৎ জগতের সন্ধান পেয়েছেন অনেকেই। Microcosm ও Macrocosm-এর মধ্যে যে অবিরত যাতায়াত, সেখান থেকেই আমাদের চেতনার স্ফুরণ। আত্মানুসন্ধানের সব থেকে বড়ো প্রণোদনাও সেটি।

ভাবতে অবাক লাগে, কবিতার 'উপকরণ' হিসেবে অনেকেই বেশ কিছু বিষয়কে এড়িয়ে যেতে চান। অন্তত মধ্যবিত্ত জীবনের কথা কবিতায় আনা, এক ধরনের মধ্যমেধার চর্চা বলে গণ্য করেন কেউ কেউ। নীরেন্দ্রনাথ সেটিকেও গুঁড়িয়ে দিলেন। বাঙালি 'মধ্যবিত্ত' তাঁর কবিতার পরিসরে বার বার নিজেকে খুঁজে পেয়েছে।

জীবনের হাজার ক্ষত ও ক্লেদের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে যে-সুন্দর, তাকেই বার বার দেখতে চেয়েছেন তিনি। এই সুন্দর, বলাই বাহুল্য, দেশকালব্যক্তি-নিরপেক্ষ। 'অল্প-একটু আকাশ' কবিতাটিতে আমরা পাই এক ক্ষয়ে যাওয়া মধ্যবিত্তের কথা:

> রুগ্‌ণ স্ত্রীকে মেজার-গ্লাসে-মাপা ওষুধ খাইয়ে,
> কুঁচকে-যাওয়া বালিশটাকে গুছিয়ে রেখে,
> ঘুমন্ত ছেলের ইজেরের দড়িটাকে আর-একটু আলগা করে দিয়ে,
> সে তাই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

কোনো একটি পঙ্‌ক্তি বিচ্ছিন্নভাবে এই কবিতার সম্পদ নয়। সমগ্র কবিতাটি তার সমগ্রতা নিয়ে নিজেই নিজের সম্পদ। ঘুমন্ত ছেলের ইজেরের দড়ি আলগা করে দেবার বিষয়টি আমাদের অতি চেনা। কিন্তু সেটিও যে এইভাবে কবিতায় উঠে ব্যবহৃত হতে পারে, সেটা ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়।

আসলে দর্শনের সু-উচ্চ মিনারে নয়, জীবন ও প্রকৃতির কোণে কোণে আলো ফেলে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। নিরাভরণের সাধনা তাঁর সম্পদ।

এই বস্তুপৃথিবী কি মানুষের চেতন-নিরপেক্ষ? এই বিশ্বচরাচর কি অপেক্ষা করে থাকে শুধু এক চেতনাসম্পন্ন প্রাণ একদিন তার দিকে চোখ তুলে তাকাবে বলে? মানুষের পরম আশ্রয় প্রকৃতিই। চিরকাল জানা ও শোনা এই বোধের জগৎটিকেও প্রসারিত করে দেন নীরেন্দ্রনাথ, তাঁর এক কবিতার মধ্য দিয়ে। জলের কাছে, এক হেরে যাওয়া মানুষের মতন দাঁড়িয়ে থাকা বাবলা গাছের কাছে, এসে পড়েছে এক মানুষ। "জীবনের কাছে মার খেয়ে/প্রকৃতির কাছে সে তার দুঃখ জানাতে এসেছিল।"

এটাই তো স্বাভাবিক। এতদিন আমরা জেনে এসেছি, মানুষ তার চরম শোকের দিনে প্রকৃতির কাছে ফিরে যায়। কিন্তু সে-মানুষটি ভাবতেই পারেনি যে, "নদীর ধারে সেই বাবলা গাছটিকে আজ/ বিষণ্ণ একটা মানুষের মতো দেখবে।"

যে-প্রকৃতি নিজেই একটা বিষণ্ণ মানুষের মতো বাবলা গাছকে বুকে নিয়ে বিষণ্ণতর, তার কানে কানে কীভাবে আর নিজের বিষণ্ণতার কথা বলে যাবে মানুষ! ফলে—

> নদীকে সে তার দুঃখ জানাতে এসেছিল;
> জানাল না।
> সন্ধ্যার আগেই সে তার ঘরে ফিরে এল। ('জলের কল্লোলে')

নীরেন্দ্রনাথের সব থেকে বিখ্যাত দুটি কবিতা সম্ভবত 'অমলকান্তি' ও 'কলকাতার যিশু'। 'অমলকান্তি' কবিতায় কবি যে স্কুলের 'ব্যর্থ' বন্ধুটির কথা বলেছেন, তাকে যেন আমরা সবাই চিনি:

> সেই অমলকান্তি— রোদ্দুরের কথা ভাবতে-ভাবতে
> ভাবতে-ভাবতে
> যে একদিন রোদ্দুর হয়ে যেতে চেয়েছিল।

— আসলে আমাদের সবার মধ্যেই যে এক-একজন অমলকান্তি বাস

নীরেন্দ্রনাথের দর্শনের জগৎটিকে আচ্ছন্ন করে আছে লৌকিক দর্শনের বিশাল ও গভীর ব্যাপ্তি। তিনি ঝুঁকে পড়েননি কবিতাকে দর্শনের ভারে ভারাক্রান্ত করবার প্রাণান্তকর চেষ্টার দিকেও।

করে, জীবনের সব সফলতার পরেও যে ক্লান্ত আর ব্যর্থ মুখ আমাদের তাড়া করে ফেরে, সে-দিকেই আলো ফেলেছেন নীরেন্দ্রনাথ।

ঠিক একইভাবে 'কলকাতার যিশু' আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনযাপনের বাইরে অবস্থানকারী এক উদ্দাম জীবন। পরোয়াহীন, ভ্রূক্ষেপহীন এক জীবনের সন্ধান দিয়ে যায় কলকাতার ফুটপাথবাসী এক শিশু:

স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখছে,
টালমাটাল পায়ে
রাস্তার এক-পার থেকে অন্য-পারে হেঁটে চলে যায়
সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি শিশু।

— এই শিশুর প্রতীকের আড়াল থেকে উঁকি মারে এক সত্তা। কী সেই সত্তা?

সমগ্র বিশ্বকে তুমি পেতে চাও
হাতের মুঠোয়। যেন তাই
টালমাটাল পায়ে তুমি
পৃথিবীর এক-কিনার থেকে অন্য-কিনারে চলেছ।

— আর যে-কবিতাটির কথা উল্লেখ না-করলে নীরেন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা সম্পূর্ণতা পায় না, সেটি হল 'উলঙ্গ রাজা'। তীব্র ব্যঙ্গ আর কৌতুক দিয়ে তিনি আধুনিক মানুষের সুবিধাবাদী চরিত্রটির মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন। তিনি সন্ধান করতে চেয়েছেন সেই নির্ভীক সত্তার, সেই নির্লোভ ও মেরুদণ্ড সোজা রাখা শিশুটির, যে এই মেকি সভ্যতার গালে থাপ্পড় মেরে বলে উঠবে, "রাজা তোর কাপড় কোথায়?"

বাংলা কবিতার সব থেকে বেশি জনপ্রিয় ও বিখ্যাত কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম নীরেন্দ্রনাথের এই কবিতাটি।

২

নীরেন্দ্রনাথ অসামান্য এক কবি, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি খুব বড়ো মাপের ভাষাপ্রেমিক ও ভাষাভাবুকও বটে। সারাজীবন তিনি অসামান্য সব গদ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। শিশু সাহিত্যের সব-কটি অলিন্দেই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন।

সারাজীবন ভেবেছেন বাংলাভাষার ব্যাকরণ ও বানানবিধি নিয়েও। এক বিখ্যাত প্রকাশনা থেকে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'কী লিখবেন, কেন লিখবেন' বাংলা গদ্য ও বানানবিধির এক অমূল্য দলিল। অত্যন্ত সরস ও সরলভাবে তিনি ভাষা ও বানানের প্রচলিত ত্রুটিগুলিকে সংশোধনের পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন তিনি 'উদ্দেশে' ও 'উদ্দেশ্যে' শব্দদুটির প্রয়োগের ভিন্নতা দেখাতে গিয়ে লিখছেন, "প্রথমটি য-ফলাবিহীন। অর্থ: 'দিকে' বা 'প্রতি'। যথা, 'কলকাতায় একটি দিন কাটিয়ে রাষ্ট্রপতি গতকাল সকালে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়ে যান।' ... দ্বিতীয় শব্দটি য-ফলাযুক্ত। অর্থ: 'অভিপ্রায়'। যথা, 'ভোট পাবার উদ্দেশ্যেই নেতারা এখন গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

— এই বইটি একটি আকরগ্রন্থ, বিশেষ করে আধুনিক বাংলা লেখার ক্ষেত্রে। এবং সব থেকে বড়ো কথা, বাংলা ব্যাকরণ ও বানান নিয়ে হাজারো বিতর্ক সরিয়ে রেখে নীরেন্দ্রনাথ সহজ ও বিজ্ঞানভিত্তিক একটি বিধি প্রচলন করতে চেয়েছিলেন।

নীরেন্দ্রনাথের 'কবিতার ক্লাস' বাংলা ছন্দশিক্ষার পদ্ধতিকে সহজ করে তুলেছে। অত্যন্ত সাদামাটা ভাষায়, প্রায় মুখের ভাষায় তিনি ছন্দের গূঢ় বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখছেন:

দ্যাখো ওই পূর্ণচন্দ্র শ্রাবণ-আকাশে,
স্বর্ণের পাত্রটি যেন শূন্য 'পরে ভাসে।

এ হল অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ... শ্রাবণ মাসের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে পূর্ণচন্দ্র আদৌ

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন কবির হাতে। রয়েছেন মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী।

দেখা সম্ভব কি না, এক্ষুনি সেই কূটকচাল তর্ক তুলে লাভ নেই। ছন্দ পালটে লিখতে পারি:

আকাশে ছড়ায় পূর্ণচাঁদের বাণী
শ্রাবণ-রাত্রি হাসে
দেখে মনে হয়, স্মরণপাত্রখানি
নীল সমুদ্রে ভাসে।

এ হল মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

আমাদের কথাগুলিকে এবারে আর-এক রকমের ছন্দে দুলিয়ে দেওয়া যাক। লেখা যাক:

দ্যাখো দ্যাখো আজকে যেন
শ্রাবণ-পূর্ণিমায়
সোনার থালা আটকে আছে
নীল আকাশের গায়।

এ হল স্বরবৃত্ত ছন্দ।

— বাংলাভাষায় এইরকম বই আর-দুটি লেখা হয়েছে কি না, সে নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। বাংলা ছন্দশিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না এই বইটি ছাড়া। রহস্যকাহিনি রচনায় নীরেন্দ্রনাথ চূড়ান্ত সফল। তাঁর 'লকারের চাবি', 'একটি হত্যার অন্তরালে', 'পাহাড়ি বিছে', 'আংটি রহস্য' ইত্যাদি বাংলা রহস্যকাহিনির জগতে চিরস্থায়ী। তাঁর গোয়েন্দা 'ভাদুড়িকে' আশ্রয় করে লেখা 'ভাদুড়ি সমগ্র' পাঠকের হাতে হাতে ঘোরে।

ছোটোদের জন্য রচিত 'খোকনের খাতা', 'ছেলেবেলা', 'বিবির ছড়া', 'নদীনালা গাছপালা' বাংলা শিশু সাহিত্যের সম্পদ।

নীরেন্দ্রনাথের মতো বড়ো মাপের অনুবাদকও বাংলা ভাষায় খুব বেশি পাওয়া সম্ভব নয়। শুধুমাত্র পার ফেবিয়ান লাগের্কভিস্টের অমর ক্লাসিক 'বারাব্বাস'-এর অসামান্য বাংলা অনুবাদের জন্য তাঁর আসন চিরস্থায়ী হয়ে আছে।

নীরেন্দ্রনাথ শুধু কবি নন। তিনি বাংলাভাষার সেই বিরল গুটি কয়েক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মধ্যে পড়েন, যাঁরা নিজেদের সাধনা আর চেষ্টায় ভাষাটিকেই বেশ কয়েক কদম এগিয়ে দিয়েছেন। ভাষা নিজেও অপেক্ষা করে থাকে এইসব সন্তানের জন্মের জন্য। ভাষার গায়ে জমে ওঠা শ্যাওলা ও পুরোনো ক্লেদ মুছে নীরেন্দ্রনাথ তাকে সবুজ করে তুলেছিলেন। বহুদিন পর সাধারণ মানুষ বাংলা কবিতার দিকে তাকিয়েছিলেন, তাকিয়েছিলেন তাঁর জাদুতে মুগ্ধ হয়েই।

নীরেন্দ্রনাথের মতো মহীরুহ চিরকাল ছায়া দেন, মায়া দেন। ভালোবাসায় ভরিয়ে রাখেন প্রজন্মের পর প্রজন্মকে, একটি ভাষাকে। ■

গত তেত্তিরিশ বছরে আল-আমীন মিশন সমাজকে উপহার দিয়েছে বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রী। পড়াশোনায় সাফল্যের পর তাঁরা দেশে-বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ পেশায় অথবা গবেষণায় ব্যস্ত। সেইসব প্রাক্তনীদের উপস্থিতি এই বিভাগে। এই সংখ্যায় চিকিৎসক

মহম্মদ হাদীউজ্জামান

জীবন জুড়ে জীবনসংগ্রাম

আসাদুল ইসলাম

মাঝে মাঝে মনে হয় এই দুনিয়াটা লড়াইয়ের ময়দান ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই ময়দানে লড়াই করে প্রতিটা জীব টিকে আছে। জীবজগতের তাবৎ জীবকুল যেখানে কেবল বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে জীবনভর, সেখানে জীবজগতের সেরা সৃষ্টি হিসেবে মানুষ চালাচ্ছে বেঁচে থাকার লড়াই, একটু ভালো থাকার লড়াই এবং আধিপত্য কায়েম করার লড়াই। অনেক সময় এমনও মনে হয়, সাফল্য মানে আর-কিছুই নয়, লড়াইয়ের একটা স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হওয়া মাত্র। টিকে থাকার লড়াইয়ের স্তর থেকে প্রভাব, প্রতিপত্তি ও আধিপত্য কায়েম করার স্তরে উন্নীত হলে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। হয়তো এই কারণেই লোকে এমন সাফল্যকে চোখ-ধাঁধানো সাফল্য বলে। আমাদের চারপাশে সাধারণ মানুষের যেসব সাফল্যকথা শুনি, তার প্রায় সবই বেঁচে থাকার লড়াই থেকে ভালো থাকার লড়াইয়ের স্তরে উন্নীত হওয়ার গল্প। এ-বারের 'উজ্জ্বল প্রাক্তনী' বিভাগে আমরা এরকমই একজন সাধারণ মানুষের লড়াই ও সাফল্যের কথা তুলে ধরব। একজনের না বলে একটি পরিবারের লড়াই ও সাফল্যের কথা বলাই ভালো, কেননা, পুরো পরিবারটাই তো একসময় পথে বসে গিয়েছিল। সেখান থেকে পরিবারের একজন সদস্য নয়, সকলেই সম্মানজনকভাবে জীবনযাপন করার দিশা খুঁজে পেয়েছেন। অকালে প্রথমে মা, পরে বাবাকে হারিয়ে ছয় সন্তান দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন। মাঠে ফসল ফলিয়ে, সবজি উৎপাদন করে, সেইসব কৃষিজাত দ্রব্য মাথায় করে নিয়ে গিয়ে হাটে বিক্রি করে আর টিউশনি পড়িয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু করেছিলেন সব ভাই-বোন মিলে। সেখান থেকে লড়াই চালিয়ে এখন ছয় ভাই-বোনই সরকারি চাকরিজীবী। এই পরিবারের সবচেয়ে ছোটো সন্তানটি মাত্র চার বছর বয়সে মাকে হারান। পথদুর্ঘটনায় বাবাকে হারান যখন তিনি পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। সে-ছাত্রটি আজ স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। 'উজ্জ্বল প্রাক্তনী' বিভাগে মূলত আমরা তাঁর কথা তুলে ধরলেও লেখাটি কেবল সেই ছাত্রের লড়াই-সাফল্যের কথা নয়, একটা পরিবারের সাফল্যকথা। অনাথ ছয় ভাই-বোন অসহায় অবস্থা থেকে যূথবদ্ধ লড়াইয়ের মাধ্যমে কীভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন, আসুন, এবার সেই গল্পে প্রবেশ করি।

আল-আমীন মিশনের যে-ছাত্রটিকে নিয়ে এ-বারের 'উজ্জ্বল প্রাক্তনী' বিভাগে আমরা লিখছি, তাঁর নাম মহম্মদ হাদীউজ্জামান। হাদীউজ্জামানের বাড়ি বীরভূম জেলার মুরারই থানার বৃপরামপুর গ্রামে। কলকাতা থেকে মুরারইয়ের দূরত্ব প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার। মুরারই স্টেশন থেকে টোটো

সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়-সেরার মানপত্র নিচ্ছেন তৎকালীন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর হাত থেকে।

বা বাসে চড়ে পশ্চিম দিকে মিনিট পনেরো গেলেই রূপরামপুর গ্রামে পৌঁছোনো যাবে। রূপরামপুর গ্রামটিকে ঘিরে আছে পলসা, ডাঙ্গাপাড়া, কুমোরডোল, এদরাকপুর, বালিয়া নামক গ্রামগুলো। বীরভূমের একদম উত্তর প্রান্তে অবস্থিত এই গ্রামগুলো রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার মাটি অত্যন্ত উর্বর হওয়ায় সব রকমের ফসল উৎপাদন হয়। ধান, গম, পাট, আখ, আলু, তৈলবীজ এবং নানা রকমের সবজির চাষ হয়। তবে ধানচাষই প্রধান। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষের জীবিকা হল চাষবাস। কিছু মানুষ ছোটোখাটো ব্যাবসা, রাজমিস্ত্রির কাজ, বিভিন্ন হাতের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। বাড়ির মেয়েদের একটা অংশ বিড়ি বাঁধার কাজের সঙ্গে যুক্ত। এলাকায় পড়াশোনার হার খুব-একটা ভালো নয়। প্রাথমিক স্তরে প্রায় সব ছেলে-মেয়ে স্কুলে ভর্তি হলেও স্কুলছুট শুরু হয় হাই স্কুলে ভর্তির শুরু থেকে। যত ওপর দিকে যায় ততই স্কুলছুট-প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়। অল্প বয়সে কাজে লেগে গিয়ে কাঁচাপয়সা রোজগার করার দুর্নিবার টানে অল্পবয়সি ছেলেদের অনেকেই বাইরে চলে যাচ্ছে। আগে পরিকাঠামোগত গ্রামের নানা সমস্যা থাকলেও বর্তমানে তেমন বিশেষ কিছু নেই। রাস্তাঘাট অনেক উন্নত হয়েছে। একটা হেলথ সেন্টার আছে। প্রাইমারি স্কুল একটা হলেও একটা এমএসকে এবং একটা আইসিডিএস সেন্টারও আছে। হাই স্কুল না থাকলেও কাছাকাছি আছে এদরাকপুর গ্রামের হাই স্কুল। রূপরামপুর গ্রাম থেকে মুরারইয়ের দূরত্ব প্রায় তিন কিলোমিটার। মুরারইয়ে আছে কলেজ, হাসপাতাল। তাই গ্রামের মানুষ সহজেই শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রের সুবিধা নেওয়ার সুযোগ নিতে পারেন। রূপরামপুর গ্রামে প্রাথমিক স্কুল একটি হলেও তিনটি পাড়ায় আছে তিনটি মসজিদ। গ্রামটি মুসলমান অধ্যুষিত হলেও, অমুসলমানরা সম্প্রীতির বাতাবরণে সম্মিলিতভাবে বসবাস করছেন দীর্ঘদিন ধরে। এরকমই একটি গ্রামে ১৯৮৪ সালের ৩০ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন মহম্মদ হাদীউজ্জামান। তাঁর পিতার নাম মহম্মদ নূর জামাল শেখ। মায়ের নাম আরজেমান্দে বানু। পিতা গ্রামেরই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। মা ছিলেন গৃহবধূ। হাদীউজ্জামান মা কী জিনিস, তা জানতেই পারেননি, কারণ, যখন তাঁর মাত্র চার বছর বয়স তখন তিনি মাকে হারান। আজ পরিণত বয়সে এসেও তিনি মায়ের মুখটা ঠিকমতো মনে করতে পারেন না। পিতা নূর জামাল শেখ স্নেহ-মমতা দিয়ে ছেলে-মেয়েদের আগলে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই আশ্রয়টুকুও হারিয়ে যায় হাদীউজ্জামানের যখন দশ-এগারো বছর বয়স। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁর আব্বা পথদুর্ঘটনায় পড়েন। বাড়ি থেকে সাইকেল নিয়ে মুরারই যাওয়ার পথে লরি ধাক্কা মারে। মাস দুই যমে-মানুষে টানাটানির পর কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে মারা যান। পিতার অকালপ্রয়াণে গোটা পরিবারটাই রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। মা মারা যাওয়ার পর একমাত্র আশ্রয় হয়ে উঠেছিলেন পিতা। খাওয়া-পরার জোগান দিয়ে নিজের দায়িত্বকে সীমায়িত করে রাখেননি তিনি, প্রত্যেকের পড়াশোনার প্রতি বিশেষ নজর দিতেন। নিজে পড়াতেন। ছেলে-মেয়েদের মানুষ করার দিকে যত্নবান ছিলেন। পিতার মৃত্যুতে এক বিরাট শূন্যতা নেমে আসে হাদীউজ্জামানদের পরিবারে। সব ক-টা ভাই-বোনই তখন পড়াশোনা করছেন। কেবল বড়োবোন মাকসুদা বেগমের বিয়ে হয়েছিল বছর খানেক আগে। হঠাৎ করেই সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব এসে পড়ে বড়োভাই শামসুল হুদার কাঁধে। তিনি তখন কলেজপড়ুয়া দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। শামসুলের চেয়ে বছর দুইয়ের বড়ো মাহমুদা খাতুন এবং বছর দুইয়ের ছোটো আবেদা খাতুন— এই দুই বোনের বিয়ে দেওয়া বাকি। ছোটো দুই ভাই শামসুজ্জোহা এবং হাদীউজ্জামানেরও ভরসাস্থল শামসুল হুদা। শামসুল সাহেব পড়লেন অকূল পাথারে। আব্বা যেটুকু সঞ্চয় করেছিলেন, তাঁর চিকিৎসা করাতে গিয়ে তার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, উপরন্তু ধার-দেনাও করতে হয়েছিল। আব্বার মৃত্যুতে যে-সকল আত্মীয় এসেছিলেন, একে একে সবাই বাড়ি ফিরে যেতে দু-একদিনের মধ্যে অতি পরিচিত তিন কামরার খোড়ো চালের মাটির বাড়িটায় থাকাই দুঃসহ হয়ে উঠল পাঁচ ভাই-বোনের কাছে। বেঁচে থাকার দায়ের কাছে শোক-পরিতাপও একসময় হার মানে। সেই দায় পাঁচ ভাই-বোনকে নিয়ে এসে ফেলল লড়াইয়ের ময়দানে। সে-লড়াই লড়তে একমাত্র সম্বল ছিল আব্বার রেখে যাওয়া ছ-সাত বিঘে চাষের জমি। কাস্তে-কোদাল হাতে তুলে নিয়ে পাঁচ ভাই-বোন শুরু করলেন বেঁচে থাকার লড়াই। প্রায় দু-মাস আব্বাকে নিয়ে হাসপাতালে ছোটাছুটি করার সময় কলেজ যেতে পারেননি শামসুল সাহেব। আব্বার মৃত্যুর পরও আর তাঁর কলেজ যাওয়া হল না সংসারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে। কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে পড়ছিলেন কলেজে। দু-বছরের পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী ব্যানার্জী এমসিএইচ-এর শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন মহম্মদ হাদীউজ্জামানের হাতে।

অপারেশন থিয়েটারে।

সেই সময়ের নিয়ম অনুযায়ী দু-বছরের পার্ট ওয়ান সম্পন্ন করার ফলে পাস কোর্সে স্নাতক হতে পেরেছিলেন। তিনি সকালে টিউশনি পড়ানো শুরু করলেন, বোনেরা শুরু করলেন বিকেলে। নিজেদের জমিতে সব রকমের ফসল ফলানোও শুরু করলেন। নানারকম শাকসবজিও ফলাতেন। সেইসব শাকসবজি স্থানীয় বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে সংসারখরচ জোগান দেওয়ার চেষ্টা চালালেন। সংসারখরচ মানে শুধু খাওয়ার খরচ জোগাড় করা নয়, ছিল খাওয়া-পরা-চিকিৎসা এবং ভাই-বোনদের পড়াশোনার খরচ জোগানো। শামসুল সাহেব নিজে পড়াশোনা ছেড়ে দিলেও ভাই-বোনদের যাতে পড়াশোনায় ছেদ না পড়ে সে-দিকে গভীর নজর রাখতে শুরু করলেন। ভাই-বোনেরাও নিজেদের পড়াশোনার বাইরে যথাসাধ্য ভাইয়ের লড়াইয়ের সহযোগী হয়ে ওঠার চেষ্টা চালালেন। চাষে খাটা আর টিউশনি পড়ানো— এই হয়ে উঠল তাঁদের জীবনধারণের মাধ্যম। বাবার গ্র্যাচুয়িটি-পেনশনের অর্থ উদ্ধার এবং চাকরিতে পরিবারের কাউকে পুনর্বহাল করার জন্য সরকারি দপ্তরে দপ্তরে ছোটাছুটি শুরু করলেন। প্রায় বছর খানেক ছোটাছুটি করার পর বাবার চাকরিতে নিয়োগপত্র পান শামসুল সাহেব। গ্র্যাচুয়িটির অর্থে মেজোবোনের বিয়ের অর্থের সংস্থান করতে পেরেছিলেন। স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী পেনশন পান, সাধারণ নিয়ম এটাই। আর যদি নাবালক সন্তান থাকে তাহলে সেও পেনশনের হকদার। ছোটোভাই হাদীউজ্জামান ছিলেন নাবালক। আদালতে আবেদন জানালে মাসিক ৫০০ টাকা পেনশনের ব্যবস্থা হয় হাদীউজ্জামান সাবালক না হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য। চাকরি পাওয়ার পর টিউশনি পড়ানো কিছুটা কমিয়ে দেন শামসুল সাহেব। দিনের বেলা স্কুল এবং বাকি সময়টা চাষবাসের কাজ করে, সন্ধ্যার পর রাত্রি দশটা-এগারোটা পর্যন্ত ভাই-বোনদের পড়াশোনা দেখিয়ে দিতেন। পড়াশোনার প্রতি যেন ন্যূনতম অবহেলা না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতেন। নিজে মাঠে চাষের কাজে চলে গেলেও ভাইদের ডাকতেন না। দাদা না বলাতেও ভাইয়েরা দাদার সঙ্গে চাষের কাজে হাত লাগাতেন। চাকরি পাওয়ার পর শামসুল সাহেব মন স্থির করে নিয়েছিলেন, ভাই-বোনেদের প্রতিষ্ঠা করে তারপর নিজে সংসার পাতবেন। সেই ভাবনামতো বোনেদের বিয়ে দেওয়ার পর, এক-এক করে ভাইয়েদের সকলকে প্রতিষ্ঠিত করার পরই সংসার পেতেছেন। ১৯৯৪ সালে চাকরি পেলেও, বারো বছর পর, ২০০৬ সালে নিজে বিয়ে করেছেন। শামসুল সাহেবের বড়ো দুই দিদি মাধ্যমিক দেওয়ার পরে কলকাতা থেকে বিটি ট্রেনিং করেছিলেন, সেই ট্রেনিঙের সুবাদেই প্রাইমারিতে শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছেন গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর। পরের বোনটিও গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন, আশাকর্মী হিসেবে কাজ করেন। পড়াশোনা শেষে উপযুক্ত পাত্র দেখে দুই বোনকে পাত্রস্থ করেছেন। তিন বোনই চাকরি পেয়েছেন তাঁদের বিয়ের পরে। ভাইয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় শামসুজ্জোহা পলিটেকনিক পাস করে বর্তমানে পঞ্চায়েত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত আছেন। আর পরিবারের ছোটোসন্তান হাদীউজ্জামান এসএসকেএম হাসপাতালে আর.এম.ও.-কাম-টিউটর, পেডিয়াট্রিক সার্জারি পদে চিকিৎসক হিসেবে চাকরি করছেন। হাদীউজ্জামানদের সব ভাই-বোনের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে দাদা শামসুল হুদার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অসময়ে শুধু সংসারের হাল ধরাই নয়, টিউশনির ভরসায় না ছেড়ে নিজে পড়িয়েছেন ভাই-বোনেদের। নিজে হাতে গড়ে তুলেছেন। কোথায় গেলে, কীভাবে পড়ালে ভাই-বোনেরা সফল হবেন, সেই চেষ্টায় কখনো কসুর করেননি। হাদীউজ্জামানরা অকালে বাবাকে হারিয়েছিলেন, বাবার অবর্তমানে বাবার ভূমিকা পালন করেছেন শামসুল হুদা সাহেব। 'পিতৃতুল্য' শব্দ মনে হয় এমন মানুষদের জন্যই তৈরি হয়েছে। হাদীউজ্জামানের জীবনের কথা জানার সময় আমরা আরও কিছুটা তাঁর পিতৃতুল্য দাদা শামসুল হুদার ভূমিকার কথা জানতে পারব। এবার আমরা ফিরে আসি হাদীউজ্জামানের কথায়।

হাদীউজ্জামানের পড়াশোনা শুরু গ্রামেরই প্রাইমারি স্কুলে, যে-স্কুলে শিক্ষকতা করতেন তাঁর আব্বা। সেই স্কুলে ছিল একটা অফিসঘর আর একটা লম্বা হলঘর, যে-হলঘরে সব ছাত্র-ছাত্রী একসঙ্গে বসে পড়াশোনা করত। হলঘরে না ধরলে কখনো কখনো গাছতলায় ক্লাস হত। বাড়িতে দাদা আর আব্বাই তাঁকে পড়া দেখিয়ে দিতেন। হাদীউজ্জামানদের তখন তিন কামরার মাটির বাড়ি। বাড়িতে বিদ্যুৎ ছিল না, হ্যারিকেনের আলোয় পড়াশোনা করতেন। ক্লাস সিক্স-সেভেনে পড়ার সময় বাড়িতে বিদ্যুৎ আসে। হাদীউজ্জামান প্রাথমিকের পাঠ শেষ করে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন এদরাকপুর হাই স্কুলে। বাড়ি থেকে স্কুলে যেতেন পায়ে হেঁটে, মিনিট পনেরো সময় লাগত। সাইকেল পেয়েছিলেন ক্লাস টেনে পড়ার সময়। হাদীউজ্জামান এদরাকপুর হাই স্কুলে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। ক্লাস ফাইভ থেকে এইট পর্যন্ত থার্ড হতেন, নাইন-টেন এই দু-বছর ফার্স্ট হয়েছিলেন। মাধ্যমিক পর্যন্ত দাদা শামসুল হুদার কাছেই পড়েছেন। মাধ্যমিক পরীক্ষার কিছুদিন আগে সুকুমার রায় নামের মুরারইয়ের একজনের কাছে পড়তে যেতেন। অঙ্ক ও বিজ্ঞান পড়তেন দাদার কাছে, সুকুমারবাবু পড়াতেন অন্য বিষয়গুলো। হাদীউজ্জামান মাধ্যমিক পরীক্ষা দেন ১৯৯৮ সালে। পেয়েছিলেন ৮৪ শতাংশ নম্বর। মাধ্যমিকের পর আসেন আল-আমীন মিশনে। আল-আমীন মিশনের প্রথম দিককার ইঞ্জিনিয়ার আপেল হক। তাঁর ভাই লুতফর, যিনি এখন আল-আমীন মিশনের পাঁচুড় শাখার অন্যতম ব্যবস্থাপক, তাঁর সঙ্গে সিউড়িতে একই মেসে থাকতেন হাদীউজ্জামানের মেজদা শামসুজ্জোহা। লুতফরের থেকে খবর পেয়ে শামসুজ্জোহা আল-আমীনের বিষয়ে তাঁর দাদা শামসুলকে বলেন। আল-আমীন নিয়ে শামসুল সাহেবের একটি সুখস্মৃতি ছিল। তিনি যখন মেসে থেকে পড়াশোনা করতেন তখন সাপ্তাহিক 'মীযান' পত্রিকা নিতেন। ওই পত্রিকায় তিনি আল-আমীন মিশনের একটি বিজ্ঞাপন দেখেছিলেন। সেই বিজ্ঞাপন দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন। আল-আমীন মিশনের সেক্রেটারি এম নুরুল ইসলাম চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন। তখন থেকেই আল-আমীন মিশন সম্পর্কে একটা ভালো লাগা কাজ করত। শামসুজ্জোহার কাছে আল-আমীন মিশনের খবর পেয়ে তাই হাদীউজ্জামানকে ভর্তি করার বিষয়ে দ্বিতীয় বার ভাবেননি। মিশনের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের একটি

হাদীউজ্জামান যে-অবস্থা থেকে সাফল্যের শিখর স্পর্শ করেছেন, তা খানিকটা অকল্পনীয়ই বলা চলে। ভাই-বোনেদের সম্মিলিত লড়াইকে সফল করতে গিয়ে নিজেকেও কম সংগ্রাম করতে হয়নি।

গুণ হল, মেধাবী পড়ুয়াদের সন্ধান পেলে তারাও যাতে মিশনে পড়ার সুযোগ পায়, সে-ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া। মিশনের ব্যাপারে সুলুকসন্ধান দেওয়া থেকে হাত ধরে নিয়ে আসা পর্যন্ত করে থাকেন মিশনের ছাত্র-ছাত্রীরা। আল-আমীন মিশনের কৃতি ছাত্র আপেল হক যেমন হাদীউজ্জামানকে সঙ্গে করে মিশনের কলকাতা অফিসে নিয়ে এসেছিলেন। সেখান থেকে খলতপুর গিয়ে ভর্তির পরীক্ষা দিয়ে আল-আমীন মিশনে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন হাদীউজ্জামান। আল-আমীন মিশনে পড়তে ফিজে কোনো ছাড় পাননি হাদীউজ্জামান। বছর চারেক হল শামসুল হুদা সাহেব চাকরি করছেন, তা ছাড়া গ্র্যাচুয়িটির টাকা পেয়েছিলেন, মাসে মাসে ৫০০ টাকা করে পেনশন পাচ্ছিলেন হাদীউজ্জামান। অন্য ভাই-বোনদের পড়াশোনা এবং বিয়ে দেওয়ার খরচ মাথার ওপরে থাকলেও ভাইকে বড়ো করার স্বপ্ন পূরণ করতে পিছপা হননি। মিশনের তখন একটিমাত্র ব্রাঞ্চ, খলতপুর। প্রতি ব্যাচে পড়ুয়াও অল্প। হাদীউজ্জামানদের ব্যাচে ছিলেন ৩৩ জন। স্যারেরা প্রত্যেককে নামে চিনতেন। সেক্রেটারি স্যার দু-এক সপ্তাহ ছাড়াই ছেলেদের নিয়ে বসতেন, প্রচুর উৎসাহ দিতেন। ছাত্রদের প্রিয় হাসেম স্যার, গোরাই স্যার সজাগ দৃষ্টি দিয়ে পড়াশোনায় ডুবিয়ে রাখতেন। ২০০০ সালের বন্যার সময় মিশনচত্বর পুরো ডুবে গিয়েছিল। হাদীউজ্জামানের মনে পড়ে, গোরাই স্যার নৌকো নিয়ে বেরিয়ে যা সবজি পাচ্ছিলেন তুলে নিয়ে এসে খাওয়ার ব্যবস্থা করছিলেন। ওই বছরের বন্যাতেই হাদীউজ্জামানদের মাটির বাড়ির বিশেষ ক্ষতি হয়, বন্যার জলের ধাক্কায় বাড়ি হেলে পড়ে।

'অনন্য প্রাক্তনী' স্মারক তুলে দিচ্ছেন মাননীয় মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। আল-আমীন মিশনের অনুষ্ঠানে।

২০০০ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছিলেন ৭৮ শতাংশ নম্বর। মিশনে এসেই হাদীউজ্জামান প্রথম ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার গল্প শুনতে পেয়েছিলেন। সেই সময় হাদীউজ্জামানদের সিনিয়র হুমায়ুন, আনারুলদের ব্যাচের ৯ জন একসঙ্গে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাওয়ায় মিশনজুড়ে হইচই হয়েছিল। হাদীউজ্জামান তখনই ভবিষ্যতে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। উচ্চ-মাধ্যমিকের সঙ্গেই ২০০০ সালে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসেছিলেন। ওই বছর হাদীউজ্জামানদের ব্যাচের কেউই মেডিকেল র‍্যাঙ্ক করতে পারেননি, ইঞ্জিনিয়ারিঙে র‍্যাঙ্ক হয়েছিল অনেকেরই। হাদীউজ্জামানের ইঞ্জিনিয়ারিং র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ২১০০। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিন্টিং টেকনোলজিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ক্লাস না করে আলাদা করে আবার ডাক্তারি পড়ার লক্ষ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স কোচিং নিতে শুরু করেন। আল-আমীন মিশনের তখন জয়েন্ট এন্ট্রান্স কোচিঙের ক্লাস হত কলকাতার পার্ক সার্কাসে। কোচিঙের ক্লাস হত শনি ও রবিবার। খলতপুর থেকে ছাত্ররা এসে শনিবারের ক্লাস করে রাতে থাকতেন খিদিরপুরের বডিগার্ড লাইনের একটি হলঘরে। সেই ঘরে একটা শতরঞ্জি পাতা থাকত। ধুলায় ধূসরিত সেই শতরঞ্জিতে সবাইকে গামছা বা চাদর বিছিয়ে শুয়ে যেতে হত। বাথরুমের অবস্থা ছিল আরও খারাপ, স্নান করতে হত রাস্তার কলে। আল-আমীন মিশনের আজকের যে ঝকঝকে বাতাবরণ, সেখানে কতটা খানাখন্দ চড়াই-উতরাই পার হয়ে পৌঁছোতে হয়েছে, তা এইসব ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বললে খানিকটা আন্দাজ হয়। এইরকম পরিবেশে হাদীউজ্জামানদের প্রায় মাস ছয়েক থাকতে হয়েছিল, তারপর বারুইপুরের যোগী বটতলায় থাকার ব্যবস্থা করা হয়। হাদীউজ্জামানরা হলেন বারুইপুরের প্রথম ব্যাচ। পরের বছর, ২০০১ সালেও হাদীউজ্জামানের মেডিকেল র‍্যাঙ্ক হল না। মনখারাপ হল বেশ। কোচিং-ক্লাসের টেস্টে ভালো রেজাল্ট হত, তাই আশাহত হননি হাদীউজ্জামান। নতুন উদ্যমে পড়াশোনা শুরু করলেন। নিজের ভুলভ্রান্তির জায়গাগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা শুরু করলেন। পরিশ্রমের ফসল পেলেন পরের বছরের পরীক্ষায়। জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেল পরীক্ষায় র‍্যাঙ্ক হল ২৩৫। ওই বছর আল-আমীন মিশন থেকে জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেলে সর্বোচ্চ ২৫ র‍্যাঙ্ক করেছিলেন আব্দুল লতিব। হাদীউজ্জামান এম.বি.বি.এস. পড়তে ভর্তি হলেন কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে। কলেজে পড়ার অর্থ-সংস্থান করতে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম থেকে একটা শিক্ষাঋণ নিয়েছিলেন। ২০০৯ সালে এম.বি.বি.এস. পাস করে মাস্টার্স করার প্রস্তুতি শুরু করেন। স্নাতকোত্তরের ভর্তির পরীক্ষায় হাদীউজ্জামান র‍্যাঙ্ক করেছিলেন ১৮৪। কোথাও কোচিং না নিয়ে নিজের চেষ্টায় পড়াশোনা করে তিনি এই র‍্যাঙ্ক করেছিলেন। ২০১৩ সালে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ থেকে জেনারেল সার্জারিতে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। এর পর পেডিয়াট্রিক সার্জারিতে সুপার স্পেসালিটি করার লক্ষ্যে আবার ভর্তির পরীক্ষায় বসেন ২০১৪ সালে। রাজ্যে মাত্র ১০-টি সিট ছিল। হাদীউজ্জামানের র‍্যাঙ্ক হয় ৪। সুপার স্পেসালিটি ডিগ্রি এম.সি.এইচ. করতে ভর্তি হন এন আর এস মেডিকেল কলেজে। ২০১৭ সালে ইউনিভার্সিটির টপার হয়ে গোল্ড মেডেলিস্ট হন। বর্তমানে এসএসকেএম হাসপাতালের আর.এম.ও.-কাম-টিউটর, পেডিয়াট্রিক সার্জারি পদে কর্মরত আছেন।

হাদীউজ্জামান যে-অবস্থা থেকে সাফল্যের শিখর স্পর্শ করেছেন, তা খানিকটা অকল্পনীয়ই বলা চলে। ভাই-বোনেদের সম্মিলিত লড়াইকে সফল করতে গিয়ে নিজেকেও কম সংগ্রাম করতে হয়নি। চাষের এমন কোনো কাজ নেই যে তিনি জানেন না। জীবনের প্রতিটি স্তরের বাধাকেই ধৈর্য আর পরিশ্রম দিয়ে অতিক্রম করেছেন। হাদীউজ্জামানের জীবনই আমাদের শেখায়, লড়াই-ই হল জীবন। লড়াই থেকে হারিয়ে যাওয়া মানে জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া। জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে লড়াই ছাড়া উপায় নেই। হাদীউজ্জামানের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর দাদা শামসুল হুদার কথা জেনে শ্রদ্ধাবোধ জাগে। ফোন করি। বেশ কিছুক্ষণ কথা হয়। হাদীউজ্জামান সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেন। সেই ক-টা কথার মধ্যেই ধরা আছে হাদীউজ্জামানের সফল হওয়ার সূত্র। "ওর সহ্যক্ষমতা খুব। মুখের ওপর কোনোদিন কথা বলেনি। আমাকে বাপ-মার মতোই মনে করে। এত বড়ো ডাক্তার হয়েছে, তবু আজও বাড়ি এলে, আমি যদি বাইরে কোথাও বের হচ্ছি দেখে, সামনে থাকলে হাতে করে এনে আমার জুতোটা এগিয়ে দেয়। এমন ছেলে আল্লাহ্‌র দান।" কথা বলতে বলতে গলা ধরে আসে হাদীউজ্জামানের দাদার। ফোনটা ছেড়ে হাদীউজ্জামানের মুখটা মনে করার চেষ্টা করতে থাকি। সফল অনেকেই হন, ভালো মানুষ সবাই হতে পারেন না। একইসঙ্গে সফল এবং ভালো মানুষ দেখার জন্যই, হাদীউজ্জামানের মুখটা বার বার মনে করার চেষ্টা করতে থাকি, করতেই থাকি। ■

ব্যবস্থাপনা: মহম্মদ মহসীন আলি

কথায় আছে, গাঁয়ে আর মায়ে সমান। হুই যে দূরে সবুজ রেখা, ওই দিকেই গেছে রেললাইন, রাজ্য সড়ক, পঞ্চায়েতের রাস্তা। কোথাও-বা আলপথ। সব পথই গেছে কোনো-না-কোনো গাঁয়ে। কেননা, বাংলায় গ্রামই এখনও সংখ্যায় অধিক। আর বঙ্গাদর্শনের ইচ্ছে হলে যেতে হবে ওইসব গ্রামদেশে।

অশোককুমার কুণ্ডু

প্রবাসের চিঠি, আত্মজাকে

ষ ষ্ঠ কি স্তি

বর্ষা ঋতু কবিদের প্রিয়। সেই কালিদাসের কাল থেকেই। অবশ্য বঙ্গের বিশ্ববিখ্যাত কবি, রবিকবি প্রতিটি মাস-ঋতুকেই কথা ও সুরে আমন্ত্রণ করেছেন। বোধ করি, বর্ষা নিয়ে তাঁর অধিক গান। তুমি, রিখিয়া নেটে পাবে রবীন্দ্রনাথের গান। এ-বাংলার গায়িকাদের গান পাবে। ওপার বাংলার, বাংলাদেশের শিল্পীদের গান আজকাল শোনার সুযোগ পাচ্ছি অ্যান্ড্রয়েড ফোনের কল্যাণে। এঁদের গান শোনার সুযোগ এতকাল আমার অধরা ছিল। তুমি হাসছ খিয়া। ভাবছ, যে-মানুষটা অতীত খুঁজে মরে, সে নেট-ফেসবুকে! না রিয়া, আমি তোমাদের পথেই আমার বিশ্বাস খুঁজে পাব, এমন বিশ্বাসে মজেছি। গান ছেড়ে এবারে একটু হারানো পথে, প্রায় লুপ্ত লোকজীবনের একটি চালচিত্র এঁকে তোমাকে পাঠাচ্ছি।

বর্ষায় গরিব মানুষও জামাইষষ্ঠী সমাচারে মাতে। কথায় বলে, ‘জামাই ছেলের দেড়া’। মানে দেড়গুণ। কেন এমন বলে? ভেবে দেখেছি, পেয়েছিও। বিবাহিত কন্যা, বিবাহপূর্ব বহু স্মৃতি রেখে যায় মা-বাপের গৃহস্থালীতে, হেঁশেলে। সেই অভিজ্ঞতা সম্বল করেই প্রবাসে সে আপন সংসার গড়ে। তাকে এবং তার বরকে বিশেষ নিমন্ত্রণ, ওই বিশেষ পারিবারিক পরব ভরে ওঠে জামাইষষ্ঠীতে। বছরের তো ওই বিশেষ একটি দিন। বিয়ের পরের প্রথম জামাইষষ্ঠী হয় ঘটা করে। জামাই আসে বিবাহিত কন্যার সঙ্গো। সে-সময় কন্যার পদক্ষেপে থাকে বুলেট ট্রেন। ওই গতিতে নূপুরেরাও তাল

সামলাতে পারে না। অনেক এগিয়ে পড়া এয়োতি হাত নাড়ে স্বামীর দিকে, "জোরে হাঁটো। বুড়ো মেরে গেলে নাকি?"

কথায় বলে জামাই-আদর, জামাই-খাতির। জামাইদের খাদ্যপাত্রে নকশা-আঁকা মাছের ছবি লেখা থাকত। ভাত খাবার বড়ো বগি থালা। ভাত-সহ, ছোট্ট সাদা টিলার চারদিকে, ওই থালার কোলে, প্রথমে ছোট্ট বাটিতে গরম গব্য ঘৃত। এরপর আলুসেদ্ধর তালের মাথায় পোঁতা তেলাপোকা রঙের ভাজা শুকনো লঙ্কার মুখ। বোঁটা ঊর্ধ্বমুখী। বেশি ঝালের পাকা, ধানি অথবা কাঁচা লঙ্কা নয়। বেশি ঝালের জ্বালায় শত্তুর বাড়ে। সে-শত্রু ঝাল ঝাড়বে, এমন লঙ্কা লোকজীবনের চালচিত্রে। আলুসেদ্ধর পরের বাটি সুক্তো। ওহো যা! ভুল হল। আলুভাতের শরীরে ভাজা তেলের জিরে, ঝিকিমিকি তারার মতন। এরপরেই আলুভাজা। উঁহু, লম্বা, সরু, ঝিরিঝিরি আলুভাজা নয়। ওটা সকালে ফুলকো লুচির সঙ্গে জলখাবার বেলায়। অথবা বিকেলে মোটা চালের মুড়ির সঙ্গে।

দুপুরের ভাতে, জামাইয়ের পাতে তিন নম্বর পদ, গোল গোল ভাজা আলুর চাকতি। সুগোল। ওপরে গোটা পোস্তর নীরব মিছিল। তিন নম্বর বাটিতে মুগ ডাল। জামাইয়ের বাটির কানা ঢেউ-খেলানো। ডাল ঢালতে সুবিধে হয়। ঘি-আলু-সহ শুকনো, একটু নরম, সামান্য বেশি সেদ্ধ, তিন ফুটের ভাত, প্রথম দফায়। পরের দফায় ডাল-সহ আলু অথবা বেগুন, চাকা-চাকা গোলাকার, ছাঁকা বা ডুবো তেলে ভাজা। সঙ্গে সামান্য শক্ত, দ্বিতীয় দফার আলাদা ভাত, বেশি সেদ্ধ নয়। অবশ্য সময়ভেদে পরের পদ তেতো বা সুক্তো। পরের পদ একটু অভিনব, পাঁচ-মেশালি পদ, ছ্যাঁচড়া। ডালে অবশ্যই রুই-কাতলা-মিরগেল, যা পাওয়া যায় তাদের চূর্ণ মাথা।

ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম পদগুলির বাটি, থালার বাইরে, উপবৃত্তে সাজানো। ষষ্ঠ ও সপ্তম বাটিতে দু-পদ মাছ। একটি রাই বা সাদা সরষে-সহ মাছের ঝাল, রসা। অষ্টম বাটি একটু বড়ো হবে। ওটি মাছের ঝোলের। অবশ্যই একাধিক (দু-পিস) মৎস্যখণ্ড। ঝোলের আলু লম্বা করে কাটা। নবম বাটি একটু ছোট্ট— ওতে ঘরে পাতা দই। নবম বাটি কাচের, অতি অবশ্যই। ওই কাচের বাটির বর্ণ একটু নীলাভ। কাব্য করছি না একটুও। আজকাল ওই বাটি আর দেখতে পাই না। দশম বাটিও কাচের। ওটি চাটনির। সময়ের ফসল টমেটো, আম, তেঁতুল, আমআদা। শুকনো করে রাখা আমসিও চলতে পারে। কামরাঙার চাটনি, গোটা সরষের ফোড়ন-সহ অনেকাঞ্চলে সাদু। রাঢ়ের অনেক অঞ্চলে পাকা, পোনা মাছের পুরোনো তেঁতুল-সহ চাটনি, অতি বিখ্যাত ও প্রিয়। খাদ্যবিজ্ঞানীরা বলেন, খাবার শেষে অম্ল, টক বা চাটনি, অতি ভোজনের পরে ডাইজেস্টিভের ভূমিকা নেয়।

একই পদ ঘুরে আসবে না পরদিন। ডাল ভাত তো হাতের পাঁচ। তখন এক পদ মাছ সরে গিয়ে আসবে মাংস। মুরগি ঢুকত না এককালে হিন্দুবাড়িতে। তাই দূরের হাট থেকে আনতে হত ছাগলের মাংস, শাল পাতার মোড়ক বাইরে, ভিতরে কচু পাতার মোড়ক— ডবল প্যাক। জামাকাপড় বা ব্যাগে দাগ লাগবে না। এখন অবশ্য ড্রেসড, হাইব্রিড মুরগি হিন্দুর হেঁশেলে খুশবু ছড়াচ্ছে। দশটি বাটিতে নানা পদ কেন, প্রশ্নের সদ্উত্তর: দশদিক থেকে মঙ্গল প্রার্থনা। ছ-টি বাটি হলে ষষ্ঠীর আশীর্বাদে বহু সন্তান হবে। মা-ষষ্ঠীর কৃপায়, কৃপা বলে কথা।

জামাইয়ের খাবার আসনের কথা বলে নিই একটু। সে-আসন 'তোলা-আসন'। অবরে-সবরে যেমন বের হয় পোর্টম্যান্টো থেকে ন্যাপথলিনের সুগন্ধ-সহ তোলা কাপড়, উৎসবে, পাইল-পরবে। ওই আসনের চারদিকে পুরোনো, পরিত্যক্ত কাপড়ের পাড়। চিত্রার্পিত, বর্ণিল ময়ূর-ময়ূরী খেলা করে। অথবা ক্লান্ত আট বেহারা পালকি নিয়ে ছোটে, হুহুমনা হুহুমনা করে। সেই পাড় জুড়ে দেওয়া আসনের খোলের চতুর্ভুজ। সংসার চলত, 'ইউজ অ্যান্ড থ্রো' দর্শনে নয়। সমস্ত জিনিস মিলেমিশে গোটা সংসার। একটি চালচিত্রে বাঁধা থাকত, একটিই সুর, চরৈবেতি। আসনের শরীরে খোল, পাতলা চটের খণ্ড, দোকান থেকে কেনা। ওর খোল সাজত নানা রঙের সুতোয়। সে-সুতো বয়স্ক এয়োতির পরিত্যক্ত একরঙা পাড়ের

শাড়ি। দ্বিতীয় বা তৃতীয় জেনারেশন— জামাই হয়েছে। পুত্র বড়ো। বউমা এসেছে সংসারে। মেয়ের বিয়ে হয়েছে। এখন কি আর রঙিন শাড়ি চলে? তাই সাদা খোলের একরঙা লাল অথবা নীল বা কমলা পাড়। শাড়িতে ছড়ানো দু-দশ বুটি/গুটি চলতে পারে। ওই শাড়ির পাড়।

গোটা দুপুর চলত ওই পাড় থেকে সুতো তোলার পালা, পা বিছিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে সুতো তোলার দ্বিপ্রহর। ছেঁড়া শাড়ি দিয়ে হত কাঁথা তৈরি। নারীরা বিশ্রাম নিত কাজে-কর্মে, দুপুরের ভাত-ঢুলুনিতে। ওই নানা রঙের সুতোয় ভরে যেত চটের আসনের শরীর। তাতে লেখা থাকত, 'এসো বোসো আহারে'। মাঝে থাকত ফুল, দু-টি। প্রস্ফুটিত ফুল দু-টি, প্রেমের। মানুষের বাঁচা প্রেমে। চলে যাওয়াও প্রেমে। বিরহও প্রেমেরই। শচীনকর্তার গানে তাই, বিরহ বড়ো ভালো লাগে।

জামাই আসলে 'বোকা'। সে মরে দু-বার। প্রথম বারে বিয়ে করে মজে এবং মরে। দ্বিতীয় মরণ তো সকল প্রাণীরই সমর্পিত ধীর লয়। জামাইয়ের উদ্দেশে বলা হত গ্রাম্য বচনে, 'শালি নাই যার/ বেথা বিয়ে তার'। নতুন জামাই এলেই শালিরা হয়ে উঠত সব আর্মড-ব্যাটেলিয়ান। কেমন সে-যুদ্ধ? তার ছবি এঁকে দিই শব্দে-বাক্যে।

চূড়া করে সাজানো সফেদ ভাত, অবাকপিরামিড। গরম ভাত সাজাত শালিরা। ভাতের চুড়ো চেপে চেপে এক্কেবারে ঝুনো নারকেল। হাতে তাপ লাগত। তাই জামবাটির জলে দক্ষিণ হাত চুবিয়ে নিত। লেফট হ্যান্ডার শালি, যাদের ব্যঙ্গ বচনে বলা হত 'লেটি', তারা ভাতে হাত দেবার সুযোগ পেত না। একে অন্ন, তায় মা-লক্ষ্মী। দুইয়ে জামাইয়ের ভাত। ওই ভাতের বেস অর্থাৎ গোলাকার ভূমিতলের চারদিকে শেষ অন্নকণাগুলি একটির পিছনে একটি। যেমন রজনীগন্ধা মালার পুষ্পদলের মিছিল। চলেছে নীরবে। সমস্বরে, নিতে হবে নিতে হবে। 'সব নিতে চাই, সব নিতে ভাই রে' নয়। আমি পেটে যেতে চাই সব রে।

ওই ভাতের চূড়ার পেটে পোরা থাকত ছোট্ট পাথরের খণ্ড। বাচ্চা মেয়েদের রান্না-রান্না খেলার ঘরের নোড়া। বোকা জামাই ভাতের চুড়োয় বাঘের থাবা বসালেই পাথরখণ্ড চোখ মেলত। ঘরের বাইরে শালিরা ওই মুহূর্তের অপেক্ষায়, একযোগে শাঁখে ফুঁ দিত। আর হুলুধ্বনি ও হাসির হল্লা। পড়শিরা অসময়ে শাঁখের ধ্বনি শুনে বুঝতে পারত, বলত, 'জামাই বোকা, বোকা জামাই'। শুধু ঠকলেই পরিত্রাণ আছে? ঠকা জামাই, বোকা জামাইকে পাঁচ সিকে জরিমানা দিতে হত। নয়তো দূরের সিনেমা হল, চাঁচের দেয়াল দেওয়া, সামনে চটে বসে উনিশ পয়সার টিকিটে বা পিছনের সিটে আট আনার বেঞ্চে, বউ-শালি-সহ 'মহাতীর্থ কালীঘাট' দেখে ফিরত।

তেল মাখার বাটিতে, খাঁটি সরষের তেলের সঙ্গে মধু মেশাত শালিরা। সুগন্ধি, তাতে থাকত ন্যাপথলিন। বোকা, 'কানা' জামাই কানে-নাকে তেলের ফোঁটা দিয়েও বুঝতে না পারলে, পেটে-পিঠে তৈলাক্ত করতল থাবড়ানোর পরেই, শুরু হত কুমারী শালিদের হো হো, হি হি, হা হা।

তিন নম্বর ঠকানো। লুচির ভিতরে থাকত সুগোল লুচিরই আকারের, একটু ছোটো পরিষ্কার পাতলা কাপড়ের টুকরো। ওভাবেই বেলা হত। রাক্ষুসে জামাই হলে গোটা লুচি মুখে পুরে পস্তাত। সেয়ানা জামাই হলে মাঝে বসা বা বিশেষ ওই লুচি চিনতে পেরে, পাশে সরিয়ে, আসল লুচি খেয়ে ফেলত। আসন ছেড়ে ওঠার সময় চোখ মেরে শালিদের উদ্দেশে বলত, "বাকিগুলো তোমরা খাও, পারুল-ছবি-অঞ্জনা-বুলা।" তবে জামাই-লুচির ময়েম-আকার আলাদা। সুগোল, শিউলি-সাদা। ফুলকো। তার ফোলা গালে কালোজিরের ফোড়ন, মনোহরণ। লুচির গা থেকে তেল গড়াবে না। ভাজার পরে ঝরিয়ে নিতে হত। আর ফোলা থাকত শেষ লুচিটিও খাবার সময়ে। ওর চাঁদিতে টুসকি মারলে শিলিগুড়ি থেকে ট্রয় ট্রেন ধোঁয়া ছাড়বে। অবিশ্যি সাদা ধোঁয়া। ঠকানোর লুচি দু-চার। বাকি সব সত্যি। অবশ্য ঠকানোর জিনিস কদাচ বানাতেন শাশুড়িমা। ওগুলো শালিদের তৈরি একান্তই। ওগুলো তৈরির পর্বে শাশুড়িমা বৃহৎ ঘোমটার আড়ালে মিটির মিটি হাসত। হয়তো স্মরণে আসত কৈশোরকালের কালান্তর, ব্যাকফুটে।

আরও আছে। এগুলো সব রাতের দিকে, লণ্ঠন বা হ্যারিকেনের আলোতে। বিদ্যুতের কড়া-চড়া আলো নেই। নিরীহ সেই মৃদু আলোকদের প্রজাপতিদের করেছে জাতক-জাতিস্মর।

পানের মতোই, ওরকমই দেখতে এক বুনো পাতায়, বর্ষাকালে ওই পানের খিলি। অভাবে কচি কলা পাতায় পানের খিলি। সুপারির বদলে তালের আঁটির ভিতরের সাদা অংশ কেটে বা ঝুনো নারকেল টুকরো। গোলমরিচ পোরা, খিলিতে অবশ্য সুন্দর লবঙ্গ এফোঁড়-ওফোঁড় গাঁথা। পিতলের রেকাবিতে আলো ঠিকরাত। ওতে যেমন থাকত 'মিথ্যে' মিঠে, সত্যি মনোমোহিনী পানের খিলিও। তেমনি রেকাবিতে থাকত ছড়ানো সত্যি সুপুরি, মিহি কাট, দারুচিনি, এলাচ ও লবঙ্গ। ঘোড়েল-অভিজ্ঞ-দোজবরে জামাই কী করত জানা হয়নি। তবে সেয়ানা জামাই ঠকার পরে স্বাদ বুঝে

গেলেও মচমচিয়ে খেয়ে নিত সবটা। ভাবটা, ভাঙব তবু মচকাব না।

এসব লোকাচার শ্বশুরবাড়ি আসার আগে বাড়িতে শিখিয়ে পড়িয়ে দিত ঘরের ছেলেকে। তবুও ঠকত। নববিবাহের সুগন্ধ আনমনা করে দিত। শালিদের কোলাহল, স্ত্রীর মৃদু 'বিশ্বাসঘাতকতা' এসব আনন্দ দিত। আমি তো ইচ্ছে করে, বলে-কয়ে ঠকতাম। তবে আসন, তা যতই চিত্রার্পিত হোক-না-কেন, বসার আগে পা দিয়ে পরখ করে, সামান্য টেনে, অথবা পায়ের চাপে দেখে নিতে হয়। আসনের নীচে সামান্য গর্ত আছে কি না। বড়ো গর্ত তো সমস্ত জীবনভর সামলাতে হবে ভবিষ্যতে। ছোট্ট গর্তটির ওপরে বসে খাওয়া বেশ অসোয়াস্তির। না বসে তৃপ্তি, না খেয়ে। তবে খোঁড়া জামাইয়ের বেত্তান্ত-বৃত্তান্ত বলে নিই।

বড়ো পিঁড়ে, জামাই-পিঁড়ে, ওতে বসে খাবে জামাই। পিঁড়ের চার পায়ের নীচে গোটা সুপারি। বসতে গিয়ে পিঁড়ে সুখাদ্য ও জামাই উলটে পড়ল। পতন ও মূর্ছা। পা ভাঙল জামাইয়ের। পায়ের হাড় জোড়া লাগল না জামাইবাবাজির। জোড়া লাগল না দু-বাড়ির সম্পর্কও। গোটা মানুষটি 'খোঁড়া' বদনাম নিয়ে কাটাল বাকি জীবনটা। অবশ্য বউকে জীবনভর গঞ্জনা সইতে হত।

রাতের আহারের পরে মুখশুদ্ধি, পানের রেকাবির কানার ছোট্ট ছিদ্রে বাঁধা হাতলম্বা কালো সুতো, জামাই-আসনের বিপরীতে তা থাকত। ভরা পেটে শ্রাবণমেঘের উদ্গার তুলে, জামাই পান-সুপারি তুলবার আগেই, একটানে খ্যাপলা জালের টান। পান-সুপারির রেকাবি তখন বাউন্ডারির বাইরে, সপাটে শালিদের ছয়। ও রিখি, ও খিয়া, ও রিয়া, রিখিয়া ঘুমিয়ে পড়লে বুঝি?

ঘরজামাইদের কথা জানি না। তবে লোকাচারে সাবধানী: জামাই যেন শ্বশুরবাড়িতে তে-রাতের বেশি কাটায় না, আদর কমবে। এবং লোকাচারে আরও নিষেধ: ঘন ঘন শ্বশুরবাড়িতে যেতে নাই। গপ্পোটা এমন: শ্বশুবাড়িতে চার জামাই। মাসাধিক কাল। শ্বশুর-শাশুড়ির হাঁড়ির হাল। চার নং জামাই কমবয়সি, হরি। পরের জন মাধব। তার আগের জন পুণ্ডরীকাক্ষ। বয়স্ক জামাই আমাদের ধনা, ধনঞ্জয়। প্রথম হপ্তা ভালোই কাটল। ক্রমশ খাদ্যের রূপ ও স্বাদ কমছে। দ্বিতীয় সপ্তাহে, 'হবিব (ঘি) বিনা হরি যাতি'। ঘি-এর বাটি নেই। হরি ওরফে হরে পালাল। দ্বিতীয় সপ্তাহে, 'বিনা পিঠে (পিঁড়ে)

> চূড়া করে সাজানো সফেদ ভাত, অবাকপিরামিড। গরম ভাত সাজাত শালিরা। ভাতের চুড়ো চেপে চেপে এক্কেবারে ঝুনো নারকেল। হাতে তাপ লাগত। তাই জামবাটির জলে দক্ষিণ হাত চুবিয়ে নিত।

ন মাধব'। বসতে দেয়নি পিঁড়েতে। খাতির আরও কমেছে। অযত্ন বুঝে মাধব চলে গেল। তৃতীয়জন পুণ্ডরীকাক্ষ, সবার বড়ো জামাইকে শুধাল, "দাদা, কী করা যায়?" কেননা, পুণ্ডরীকাক্ষের পাতে দিয়েছে কচুসেদ্ধ বা পোড়া। 'পুণ্ডবউ (কচু) পুণ্ডরীকাক্ষ'। থালা ছেড়ে পুণ্ডরীকাক্ষ পালাল শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে। শেষজন ধনঞ্জয়, আমাদের ধনা। সে ঘি ছাড়া, পিঁড়ে ছাড়া, কচুসেদ্ধ দিয়েই ভাত মারছে। যাবার নামটি নেই। শেষে, মূর্খসঃ লাঠ্যৌষধি। 'প্রহারে নঃ ধনঞ্জয়'— মার খেয়ে ধনঞ্জয় পালাল। বর্ষায় জামাইষষ্ঠী কাছে এলেই মনে ইচ্ছে জাগে, পেটুক আমির, আর-একটা বিয়ে করি। আবার জামাইপিঁড়িতে বসি। শুধু, প্রহারে নঃ ধনঞ্জয়ের অবস্থা ভেবে পিছিয়ে যাই। ধনঞ্জয়ের অবস্থা বর্ণন, এ-বাক্যে এখনও চালু। তবে গল্পের মুখড়া গেছে হারিয়ে।

আমাদের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের আষাঢ়ে গপ্পো, জামাইদের নিয়ে। ঝি জামাই ভাগ্নে/এ-তিন নয় আপনে— প্রবাদ চালু। এ-যুগের মায়েরা বলে, "ছেলেটা

স্বার্থপর। শ্বশুরবাড়ির দিকে চলে গেল। জামাইটা খুউব ভালো। আমাদের কাছেই থাকে।"

এখন 'বোধ' সংক্ষেপের সময়। হৃদয়হীন সভ্যতার শুধুই মাথা নীচু, মোবাইলের বটনে খুটুর খুট। শুক্রবারে কাগজের পালকি। শনিবারে মধুচন্দ্র। রবিবারে খিটিমিটি। সোমবারে কালো গাউন পরিধেয় 'সত্যবাদী' আইনরক্ষকদের দফতরে। বিয়ে-সাদির প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটিকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে নব্য কাগজের বউ-বর। থুড়ি গার্ল ফেন্ড বা বয় ফ্রেন্ড। 'কাঁদলে পরে খর্চা হবে'। লিভ ইন বা লিভ আউট। সবই আউট গোয়িং। আউট সোর্সিং অনুভব, বোধ, সুখ-শোক সব।

মেয়ে জামাই এসেছে। আসা-যাওয়া আছে হপ্তান্তে। ক্যালকুলেশন করেই পাঁচ মাইল দূরত্বে বেয়াই-ফ্ল্যাট। জামাইষষ্ঠীর দিন ওরা আসবে। কোনো চিন্তা নেই। গৃহিণীর পরিশ্রম নেই কোনোই। মেনু-ডিশ সবই টু-থ্রি-ফাইভ স্টারে গ্রান্ড ডিস। নামও বাহারি। ব্রাইট বাইট ব্রেকফাস্ট। লাঞ্চ মেনুর প্যাকেজের নাম— গ্রুম-মাসরুম। অলটার চলবে এক ঘণ্টা আগে, ইনফো মেসেজে। চূড়ান্ত অনুষ্ঠানের আগে দু-বাড়ির ভিডিয়ো কনফারেন্স। জামাইষষ্ঠীর প্রিলিউড বা প্রিফেস।

গোরুর গাড়ি চলেছে। ডাইনে-বাইনের হেলে-গোরুর গলায় ঘুন্টির শব্দে গ্রামবাসীদের বিদায়-পর্বকাল জানান দিচ্ছে। জামাইষষ্ঠী শেষ। ঘরের বউরা দোরের বাইরে এসে আঁচলে চোখ মুছছে। বিয়ের দু-মাসের পরেই প্রথম জামাইষষ্ঠীপর্ব। বিয়ে, প্রবাসবাস নির্ধারিত কন্যার জীবনে। তা-ই মেনেও কান্না। গ্রামের একজন মানুষ চলে যাচ্ছে যে পরের ঘরে 'আপন' ঘর গড়তে। সই চলল, কন্যা চলল, ভগ্নী চলল। গোরুর গাড়ির ছতরির পিছনে বসে বসে সে দেখছে। দেখছে না। চোখ যে জলে ভরে যাচ্ছে। আসলে বোধ দিয়ে মনে, স্মরণে, স্মৃতিতে দেখছে। ধুলা-ওড়ানি চলেছে ভিন্ন গ্রামে। মেঠো পথে, পথের ধুলোর মেঘে ঢাকা পড়ে, জামাইষষ্ঠীর অন্তিম পর্ব, বিদায়ের পথ। ■

উনিশ-বিশ শতকের ক্রান্তিকালের বাঙালি মুসলমান সমাজের জাগরণ-প্রচেষ্টার সূচনাপর্বের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব ইসমাইল হোসেন সিরাজী। এই পাতায় রইল তাঁর একটি অগ্রন্থিত রচনার পুনর্মুদ্রণ।

তরুণের ধর্ম

ইসমাইল হোসেন সিরাজী

সংগ্রহ ও ভূমিকা

হাবিব আর রহমান

[ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০—১৯৩১)। তাঁর পারিবারিক নাম সৈয়দ ইসমাইল হোসেন। সিরাজগঞ্জে জন্মেছিলেন বলে নামের শেষে সিরাজী লিখতেন। সিরাজগঞ্জ বর্তমানে বাংলাদেশের একটি জেলা। লেখকজীবনের গোড়ায় নামের আগে পারিবারিক পদবি সৈয়দ লিখতেন। পরে তা বর্জন করেন। কখনো কখনো শুধু সিরাজী বা শিরাজী নামেও লিখতে দেখা যায়।

ইসমাইল হোসেন খ্যাত হয়েছিলেন তিনটি কারণে। একাধারে ছিলেন সাহিত্যিক, বাগ্মী ও রাজনীতিবিদ। বস্তুত সাহিত্যচর্চা ও বক্তৃতা— এই ছিল তাঁর জীবিকার্জনের উপায়। ফলে দারিদ্র্য ছিল নিত্যসঙ্গী। জন্মেছিলেনও দরিদ্র পরিবারে। সে-কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হাই স্কুলের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেনি। বলা চলে তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত মানুষ। বিশ শতকের গোড়ায় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে বাংলা প্রদেশে একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধে তুরস্কের আহত সৈন্যদের শুশ্রূষার জন্য ভারতবর্ষ থেকে যে মেডিকেল মিশন পাঠানো হয়, সিরাজী ছিলেন তার সদস্য। তুর্কি সরকার তাঁকে গাজি উপাধিতে ভূষিত করেন। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনেও তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল গঠিত হলে তিনি তাতে যোগ দেন। জ্বালাময়ী বক্তৃতার জন্য কয়েক বার কারারুদ্ধ হন।

দেশহিতের সঙ্গে মুসলমান-পুনর্জাগরণ ছিল সিরাজীজীবনের মূল লক্ষ্য। তাঁর অনলস্রাবী কাব্য 'অনল প্রবাহ' (১৯০০) ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। কাব্য ছাড়া তিনি কয়েকটি উপন্যাস ও প্রবন্ধগ্রন্থও রচনা করেন। সম্পাদনা করেন মাসিক 'নূর' ও সাপ্তাহিক 'সুলতান' নামে পত্রিকা। সিরাজীর সমগ্র রচনা এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। আমাদের সংগৃহীত রচনাটিও অগ্রন্থিত। এটি প্রকাশিত হয়েছিল মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সওগাত' পত্রিকার ১ম বর্ষ ১৯শ সংখ্যায় (২৯ ভাদ্র ১৩৩৫, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৮)।]

প্রাচীন যতদিন পর্যন্ত নব নব শক্তি, নব নব প্রেরণা ও নব নব উদ্বোধন দিবার শক্তি না হারায়, ততদিন তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি ভাবের ব্যঞ্জনা, চিন্তার প্রেরণা দিয়া থাকে। কিন্তু তাহার ভাবের উৎস এবং চিন্তাধারা যখন বিশুষ্ক হইয়া যায়, তখন পৃথিবীতে তাহার আর কোনও কর্তব্য থাকে না। তখন নূতন আসিয়া তাহার স্থান দখল করে। ইহাই সৃষ্টির সনাতন নিয়ম। এ-নিয়মের কদাপি ব্যতিক্রম হইতে পারে না এবং কখনও হয়ও না। পৃথিবী চিরদিনই নব নব ভাব এবং সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এখানে কিছুই একান্ত পুরাতন হইতে পারে না। নবীনই পৃথিবীতে চির সচল। পুরাতন চির অচল। যে-জাতি জ্ঞান চিন্তা ভাব ও পরিকল্পনায় দীর্ঘকাল হইতে অচেতন ও অসাড় হইয়া শুধুমাত্র পৃথিবীতে স্থানাবরোধ করিয়া আছে, অগ্নিপ্রাণ তরুণের দল

আগ্নেয় সাধনার ভিতর দিয়া চিন্তার নবীনতায়, ভাবের সরলতায়, জ্ঞানের অমৃতসিঞ্চনে, শক্তির বৈদ্যুতিক ব্যাটারী-স্পর্শে সেই জীবন্মৃত জাতির দেহ মস্তিষ্ক এবং মনে মহাভাবের উদ্দাম বাত্যাবর্ত প্রবাহিত করিবে— অতীত জগতের দিক হইতে তাহার দৃষ্টি আধুনিক এবং ভবিষ্যৎ জগতের দিকে আকৃষ্ট করিবে। অতীত যাহা, গত যাহা, মৃত তাহা; তাহার দিকে চাহিয়া তাহার জন্য ক্রন্দন করা মূঢ়তা এবং মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমি অতীতে বাঁচিতে যাইব না। আমি বাঁচিয়া আছি বর্তমানে এবং আরও বাঁচিব ভবিষ্যতে। সুতরাং অতীতে আমার কোনও প্রয়োজন নাই; প্রয়োজন আমার বর্তমান এবং ভবিষ্যতে।

সুতরাং বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে যাহাতে সুখময় আনন্দময় কীর্তিময় ও দীপ্তিময় করিতে পারি, তাহাই হইতেছে আমার জীবনের উদ্দেশ্য। অতীতের জন্য কাঁদিয়া অতীতকে আমি কিছুতেই ফিরাইতে পারিব না। অতীতকে আমি আর সৃষ্টি করিতে পারিব না। কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নিশ্চয়ই আমি আমার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি। আমি পুরাতনের অনুদাস হইয়া চলিব না। প্রাচীন বলিয়া, বহু কালের বহু যুগের বলিয়াই আমি কোনও একটা পদ্ধতি বা প্রণালী মূঢ়ের ন্যায় মানিয়া লইব না। আমি তরুণ; আমার সাধনায়, আমার সমুজ্জ্বল তরুণ দৃষ্টিতে, আমার কঠিন ও কঠোর গবেষণায় আধুনিক জগতের নব নব অভিযানে যাহা কিছু বাধাজনক, যাহা কিছু অসুন্দর ও অসরল, যাহা কিছু জীর্ণশীর্ণ এবং ছিন্ন, সে-সমস্ত বিধি ব্যবস্থা, সে-সমস্ত প্রথা ও তন্ত্র আমি জীর্ণ পাদুকার ন্যায় পরিত্যাগ করিব।

যাহা শাশ্বত এবং সনাতন সত্য (Fundamental truth), তাহা অবশ্যই আমি শিরোধার্য করিয়া চলিব। আমার গন্তব্য-পথে আমার সুখ-সুবিধা আনন্দ এবং জাতীয় জীবনের মহত্ত্ব ও স্বাধীনতালাভের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা আমি অবশ্যই নূতন সৃষ্টি করিয়া লইব। কারণ সৃষ্টি করাই তরুণের ধর্ম। পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন সৃষ্টির নবীন সৌন্দর্যে পৃথিবীকে আনন্দ দান করাই হইতেছে তরুণের স্বভাব। ক্রমোৎকর্ষের সাধনাতেই তরুণ জীবনের সাফল্য। তরুণ ছুটিবে গৈরিক নিঃস্রাবের মত। তরুণের প্রভাব-প্রতাপ ও দম্ভ দেখিয়া এবং প্রাচীনকে ভগ্ন করিবার ও নূতনকে সৃষ্টি করিবার অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মহীয়সী-শক্তি দেখিয়া প্রাচীন অবনত মস্তকে তরুণের পথ ছাড়িয়া দিবে। কবি বলিয়াছেন—

> "পর্বত-গৃহ ছাড়ি—
> বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে
> কার হেন সাধ্য যে, সে রোধে তার গতি।"

জাতির অধঃপতনের প্রধানতম কারণ হইতেছে পরাধীনতা। পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত না হইলে জাতি কখনও মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। পৃথিবীর নব নব শিল্প সাহিত্য বাণিজ্য ব্যবসা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে সে-জাতি কখনও প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। এজন্য পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করাই হইতেছে যাবৎ তরুণদলের একমাত্র চরম ও পরম কর্তব্য। সমস্ত প্রাচী-র এই নব-জাগরণের যুগে যখন চীন, তুর্কী, মিসর, পারস্যের তরুণদল কঠিন ও উগ্র সাধনায় জীবনাহুতি দানে স্ব স্ব জন্মভূমিকে স্বাধীনতার জয়মাল্যে বিভূষিত করিয়া প্রভাতাকাশে পতাকা তুলিয়া নব-অভিযানে ছুটিয়া চলিয়াছে— যখন এই ভারতবর্ষেই এই ম্যালেরিয়া-পীড়িত বঙ্গজননীর শ্যামলবুকে হিন্দু ভ্রাতাদিগের সহস্র সহস্র তরুণ অরুণালোকে উদ্ভাসিত হইয়া মুক্তির পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, তখনও আমাদের তরুণদিগের মধ্যে জাগরণের কোনও সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। আমাদিগের তরুণদলকে দেখিয়া, তাহাদিগের যে জীবন আছে, তাহা বিশ্বাস করাই কঠিন। জীবনের কোনও সাড়া, স্পন্দন বা কল-কোলাহলে কিম্বা নিবিড় নির্জনের কোনও নিগূঢ় সাধনায় আমাদের তরুণদিগের কোনও বিদ্যমানতাই নাই। কি নৈরাশ্যব্যঞ্জক ব্যাপার! এই যে নব্যভারতের নব-জাগরণের যৌবন-জল-তরঙ্গ, এ-তরঙ্গে বাঙ্গালি মুসলমানের সাড়া কোথায়? মুসলিম যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে রাষ্ট্রনীতি এবং মুক্তি-মন্ত্রের কোনও কথাই যেন আলোচ্য নহে। মোল্লারা রাষ্ট্রীয় জীবন এবং জাতীয় জীবনের অভ্যুত্থান ও মুক্তি সম্বন্ধে কোনও চিন্তা করিবার যেন অধিকারই রাখে না। শত শত মাদ্রাসার ছাত্র, এবং মোল্লা ও পীরদিগের সাগরেদেরা জাতীয় মুক্তির কথা স্বপ্নেও চিন্তা করে বলিয়া বোধ হয় না। প্রতিবাসী একটি জাতি যখন রাষ্ট্রীয় মুক্তির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই মুসলমানেরা নাক ডাকাইয়া ঘুম পাড়িয়াছে। হিন্দুনারীদিগের মধ্যে যে জাতীয় জীবনের স্পন্দন ও আলোক দেখা যাইতেছে, মুসলিম পুরুষদিগের মধ্যেও সে জাগরণ-প্রভাবের কিছুই দেখা যাইতেছে না। ইহা অপেক্ষা গোম্‌রাহী এবং "জুলমাতে"র ভীষণ অবস্থা আর কি হইতে পারে? এইরূপ গোম্‌রাহী এবং যুগধর্মে ঔদাস্যের ফলে প্রাচীন জগতের কত কত জাতি রাষ্ট্রনৈতিক ঘূর্ণীবাত্যায় দিকহারা তরণীর ন্যায় "বানচাল" হইয়া গিয়াছে। আমাদের তরুণেরা যদি তরুণের স্বভাব, তরুণের ধর্ম ভুলিয়া কেবল উদর-পূজা এবং সাহেব-পূজার জন্যই অমূল্য মানবজন্ম কাটাইয়া দেয়, তাহা হইলে আর উপায় কি? রাষ্ট্র, সাহিত্য, জাতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প কোনও দিক দিয়াও আমাদের একটি চক্ষুও কি জাগিতেছে? সারা বিশ্বের এই তুমুল জাগরণ-কোলাহলে আমাদের একটি কর্ণও কি চকিত হইয়াছে? সকলেই নিজ নিজ স্বার্থে পরিলিপ্ত— দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজের কথা ভাবিবে কে? জাতিকে দেশকে জাগাইতে হইলে যে তরুণের ভাব-মদিরায় সকলকে মাতাল করিতে হইবে, এ-কথা আমাদের তরুণদের মনে জাগে না কেন? যাহাদের নবীন চিন্তা, নবীন জ্ঞান ও নবীন সাধনায় নূতন রাষ্ট্র ও নূতন জাতি গড়িয়া উঠিবে, তাহারা তেজস্বিতা এবং বীর্যে অগ্ন্যুদ্গারী বিসুবিয়সের ন্যায় অক্ষয় ও দুর্জয় প্রতাপশালী হইবে; তবে পুরাতনের ধ্বংসস্তূপের উপরে নবীন রাষ্ট্র ও নবীন জাতির প্রতিষ্ঠার তাজমহল নির্মিত হইবে। সত্য শিব ও সুন্দরের পূজা ও প্রতিষ্ঠায় তরুণের প্রাণ মাতিয়া উঠিবে। তরুণের দল বর্ষার উদ্দাম তরঙ্গিণীর ন্যায় দুই কূল বিপ্লাবিত করিয়া গতিপথের তরুগুল্ম, গৃহ ও শিলাপট্ট উন্মূলিত উৎপাটিত করিয়া ছুটিয়া চলিবে। ইহাতেই তরুণের জীবন-ধারার সাফল্য ও সার্থকতা। প্রাচীনের নিন্দা বা প্রশংসা তাহার মর্মে দূরে থাক্— কর্ণেও আসিবে না। আত্মবিশ্বাসের অটল ভূমিতে তাহার সংকল্প সুপ্রতিষ্ঠিত, তটিনীর ন্যায় তাহার গতি সুনিশ্চিত, সূর্যের ন্যায় সে আপন মহিমায় মহিমান্বিত, কর্মের উদ্দীপনায় সে একান্ত উদ্দীপ্ত। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পথে, রাষ্ট্রীয় জীবনের পথে, রাষ্ট্রীয় মৈত্রীর পথে, মহত্ত্ব ও গৌরবের পথে, আবিষ্কার ও গবেষণার পথে, বিশ্ব-প্রেম ও জীবনসেবার পথে যাহা কিছু বাধা ও বিপত্তিজনক, তাহা সে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে। অধিকন্তু নূতন জগতের নূতন জ্ঞানবিজ্ঞানের সহায়ে বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় (World-Competition) আপনার অস্তিত্ব ও গৌরব রক্ষার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তৎসমুদয় অর্জনের জন্য তরুণদলের তরুণ প্রাণ শক্তির অরুণিমায় জাগিয়া উঠিবে। অসাধ্য যাহা, অভাবনীয় যাহা, দুঃসাধ্য যাহা, বিরাট যাহা, বিপুল যাহা, কঠিন ও কঠোর যাহা, তাহা সাধন করাতেই হইতেছে তরুণদের বাহাদুরী এবং যোগ্যতা। ইহাই তরুণদের পক্ষে একান্তভাবে করণীয়। যে-কোনও বিধি ব্যবস্থা, যে-কোনও প্রণালী-পদ্ধতি বা রীতি-নীতি বা সংস্কার জাতীয় অভ্যুত্থানের পক্ষে অমঙ্গলজনক, তরুণ তাহা কাচখণ্ডের ন্যায় চূর্ণ করিয়া ফেলিবে, শুষ্ক তৃণের ন্যায় প্রজ্বলিত করিয়া ফেলিবে, মৃৎপিণ্ডের ন্যায় মর্দিত করিয়া চলিবে। তরুণ সচল নূতনের জন্য অচল পুরাতনকে চূর্ণ করিয়া দিবে। ইহাই তরুণের ধর্ম, ইহাই তরুণের স্বভাব। ইহার ব্যতিক্রম যেখানে, সেখানে বুঝিতে হইবে, তরুণ চক্ষুহীন, সাহসহীন এবং চিন্তাহীন। তাহার চিত্ত জাগে নাই, বিবেকবুদ্ধির স্ফুরণ হয় নাই। তাহার জীবনের সার্থকতা কোথায় এবং কোন্ উদ্দেশ্য-সাধনে সে অগ্রসর, সে-সম্বন্ধে সে একান্ত বিমূঢ় ও অজ্ঞান। যথার্থ শিক্ষা এবং সাধনার ফলে তাহার চিত্ত-উদ্যানে বসন্তের মলয় হাওয়ার ঢেউ লাগে নাই। যৌবন সেখানে উদ্দাম ও স্ফূর্ত হইয়া জাগে নাই। ■

জলে যে কত রকমের প্রাণী জন্মায় আর বাস করে তার হিসেব পাওয়া ভার। তাদের জীবন, স্বভাব, আকার, বর্ণ— সবই বিচিত্র ও বিভিন্ন। জলজ ওইসব প্রাণীদের ঘিরে মানুষের অন্তহীন জিজ্ঞাসা। এই পাতা সেই জিজ্ঞাসু মনের উপহার।

জীবন্ত ফসিল

এন জুলফিকার

বেজায় গরম পড়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হতে চলল, অথচ বর্ষার দেখা নেই। ইদের দিন প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি একটুখানি মুখ দেখিয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গেল! ভ্যাপসা গরমে, ঘামে নাজেহাল মানুষ হাঁসফাঁস করতে করতে চাতকের মতো চেয়ে আছে আকাশের দিকে। রাস্তার ধারের দোকানগুলোতে তাই বরফ-মেশানো রঙিন পানীয় আর দেদার পাখা বিকোচ্ছে। কিন্তু তাতে কি গরম দমিয়ে রাখা যায়! প্রচণ্ড গরমের এই আবহে অফিসে আমার ছোট্ট ঘরটায় বসে আছি। মাথার ওপর সজোরে ঘুরছে পাখা, অথচ কুলকুল করে ঘামছি, আর সামনে খোলা কমপিউটারে জমিয়ে রাখছি রাজ্যের হিসেব। এমন সময় সে এল। এসেই বলল, “চলো।” আমি খানিক বিরক্ত হয়ে বললাম, “এই ভরদুপুরে কোথায় যাব?” সে বলল, “বলেছিলে না, হাটবারে আমাকে কী একটা নতুন জিনিস দেখাবে?”

— “ও হ্যাঁ, তাই তো। দাঁড়া, হাতের কাজটা আগে শেষ করে নিই।” সে খানিকটা বেজার মুখে বসে রইল।

টিফিন আওয়ারে অফিস থেকে বেরিয়ে বাজারে চলে এলাম। এখানে সপ্তাহে দু-দিন হাটবার। মঙ্গল আর শুক্র। যদিও প্রতিদিন সকাল বিকাল বাজার বসে, তবু ওই দুটো দিন ক্রেতা ও বিক্রেতার ভিড় সবচেয়ে বেশি। বাজারের প্রায় শেষপ্রান্তে এককোণে একজন কেরোসিন স্টোভ জ্বালিয়ে বসে আছে। সামনে কয়েকটি অদ্ভুতদর্শন প্রাণী। তারই একটা ডেকচিতে রেখে কী এক তেলের সঙ্গে ফোটাচ্ছে, আর চিৎকার করে বলছে, “আসুন, আসুন, নিয়ে যান সর্বরকম ব্যথার মহৌষধ— রাজ তেল। ছোটো ফাইল দশ, বড়ো ফাইল তিরিশ।” তাকে, অর্থাৎ আমার সেই সঙ্গীটিকে সেখানে নিয়ে গিয়ে বললাম, “বল তো এটা কী?” সে মাথা নেড়ে বলল, “জানি না।” এই সুযোগে তোমাদের জানিয়ে রাখি, আমার এই খুদে বন্ধুটি একটা ছোটোখাটো সবজান্তা। তার সামনে পণ্ডিতি ফলানোর এমন সুযোগ

কি হাতছাড়া করা যায়? বললাম, "শোন, এটা হল রাজকাঁকড়া। আর এর ইংরেজি নাম— হর্সশ্যু ক্র্যাব।" সে একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি আবার শুরু করলাম, "বিজ্ঞানীরা একে জীবন্ত ফসিল বা লিভিং ফসিলও বলেন।" সে আরও অবাক হয়ে গেল। বলল, "কীরকম?" বললাম, "শোন তাহলে।"

"ভাবতে ভারি অবাক লাগে জানিস, প্যালিয়োজোয়িক যুগের এই প্রাণীটি আমাদের এই সবুজ পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে চুয়াল্লিশ কোটি বছর ধরে বসবাস করছে।"

সে আঁতকে উঠে বলল, "অ্যাঁ!!!"

— "ঠিকই বলছি রে। হর্সশ্যু ক্র্যাব ওই অতগুলো বছর আগে অর্থাৎ ডাইনোসরের উদ্ভবের অনেক আগে থেকেই এই পৃথিবীতে বাস করছে। এই এতগুলো বছরে তাদের দেহের প্রায় কোনো পরিবর্তন হয়নি।"

— "এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।"

— "অবিশ্বাস্যই বটে, তবে এটাই সত্যি। এরা এতগুলো বছর ধরে যাবতীয় প্রতিকূলতা, বিপর্যয়কে হেলায় অতিক্রম করে এখনও দিব্যি পৃথিবীতে টিকে আছে। আর হয়তো এই জন্যই সমুদ্রবিজ্ঞানীরা একে 'জীবন্ত ফসিল' বলেছেন। জানিস তো, এরা সেই অর্থে কাঁকড়াই নয়, বরং মাকড়সা, এঁটেল পোকা বা কাঁকড়াবিছের গোত্রের সঙ্গে বেশি সম্পর্কিত।"

— "তাহলে রাজকাঁকড়া, বা ইংরেজিতে হর্সশ্যু ক্র্যাব বলে কেন?"

— "এই প্রাণীটার এমন নামকরণ কেন হল, তা তো বলতে পারব না। হয়তো কাঁকড়ার মতো গড়ন ও অমন পা আছে বলেই। মূলত এরা 'মেরোসটোমাটা' শ্রেণিভুক্ত, অর্থাৎ যাদের পাগুলো মাথার অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে।"

— "বেশ ইন্টারেস্টিং প্রাণী। কত যে অদ্ভুত প্রাণী আছে এই বিশ্বে, বিশেষত সমুদ্রে। ভাবলেই ভারি অবাক লাগে।"

— "ঠিক বলেছিস। একে আমরা তো রাজকাঁকড়া বলি। ঘোড়ার নালের মতো দেখতে বলে কেউ কেউ একে নালকাঁকড়াও বলে। আবার চীনারা বলে— হও, ফরাসিরা বলে— ইমুল, জাপানে একে বলে— কাবুতোগানি, আফ্রিকায় বলে— পিস্টার ক্র্যাব, শ্রীলঙ্কান তামিলরা বলে— কুদিরাই নান্দু, সোয়াহিলিরা বলে— ফারসি কা। জাপানি উপকথায় দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে রাজকাঁকড়া ঠাঁই পেয়েছে। সাহসী যোদ্ধারা, যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম বীরত্বের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করেছেন, তাঁরা নাকি পরবর্তী জীবনে রাজকাঁকড়া হয়ে জন্ম নেন। সামুরাইদের হেলমেট পরিবর্তিত হয়ে তাদের খোলসে রূপান্তরিত হয়েছে। জাপানি উপকথায়, কবিতায়, চিত্রশিল্পের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে রাজকাঁকড়া।"

— "দেখো, এদের কিন্তু অনেকগুলো চোখ!"

— "বৎস, তিষ্ঠ ক্ষণকাল। একে একে সবই বলছি তোমায়। দুটো নয়, এদের সাত-সাতটা চোখ। কিন্তু মজার কথা হল এই যে, এদের চোখগুলো শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আটকানো। পাঁচটা চোখ থাকে দেহের উপরের অংশে, আর দুটি নীচের দিকে। শক্ত খোলস দিয়ে ঢাকা রাজকাঁকড়ার দেহের মূল অংশ তিনটি। এর মাথার দিকটা ঘোড়ার নালের মতো। ওখানেই আছে ওর মুখ, একজোড়া সাঁড়াশি এবং পাঁচ-জোড়া পা। এদের পাগুলোর ঠিক মাঝখানে মুখের অবস্থান। পরের অংশ পেট, যা মাথার অংশের তুলনায় বেশ ছোটো। আর সবশেষে আছে প্রায় ৮ থেকে ১০ ইঞ্চি লম্বা শক্ত ছড়ির মতো লেজ।"

— "প্রাণীটা বেশ মজার। কিন্তু ওর লেজে কি বিষ আছে?"

— "আরে না-না। ওকে দেখতে কিম্ভূত হলে কী হবে, প্রাণীটা কিন্তু আদৌ হিংস্র নয়। আর ওর লেজে কোনো বিষও নেই। এসবই সাধারণ মানুষের কিছু ভুল ধারণা। রাজকাঁকড়ার এই লেজ রেডারের কাজ করে, সাথে সাথে ডাঙায় তাকে ঘুরতেও সাহায্য করে।"

— "কিন্তু এরা খায়-বা কী?"

— "এরা মাংসাশী প্রাণী। সর্বভুকও। সাধারণত সামুদ্রিক পোকামাকড়, শ্যাওলা, ঝিনুক— এসবই এদের খাদ্য।"

সমুদ্রের কিম্ভূতদর্শন এই প্রাণীটি সাধারণত সমুদ্র উপকূলের মৃদু ঢেউ-খেলা নরম বালিয়াড়ি ও কর্দমাক্ত অঞ্চলে ডিম পাড়ার ঋতুতে বেশিরভাগ সময় থাকে। সাধারণত মে-জুন নাগাদ এরা ডিম পাড়ে। এই সময় স্ত্রী-রাজকাঁকড়া সমুদ্র-উপকূলের মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। আর পুরুষ-রাজকাঁকড়ার কাজ হল সেগুলো পাহারা দিয়ে তার থেকে বাচ্চা ফোটাতে সাহায্য করা।

রাজকাঁকড়ার ডিম হালকা হলুদ রঙের। কিছুদিন পরে সেটা হালকা নীলাভ হয়ে যায়। স্ত্রী-রাজকাঁকড়া এক-এক বারে কয়েক হাজার করে প্রতি ঋতুতে ৬০, ০০০ থেকে প্রায় ১,২০,০০০-টি ডিম পাড়তে পারে। লিমুলাস পলিফেমাস গোত্রের রাজকাঁকড়ার ডিম ফুটে বাচ্চা হতে সময় লাগে প্রায় দুই থেকে তিন সপ্তাহ। তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে অন্য প্রজাতির সময় লাগে প্রায় চার থেকে ছয় সপ্তাহ। কিন্তু সমুদ্র-উপকূলে থাকা পরিযায়ী পাখিরা ডিম ফোটার আগেই রাজকাঁকড়ার বেশিরভাগ ডিম খেয়ে ফেলে। তাই অতগুলো ডিম থেকে জন্মায় মাত্র আট-দশটা করে

রাজকাঁকড়া। কচ্ছপ ও সিগাল পাখি তো রাজকাঁকড়া ধরে মৌজ করে খায়। রাজকাঁকড়ার লার্ভা প্রথম বছরে ছ-বার এবং তার পর থেকে চার বছর পর্যন্ত বছরে একবার করে খোলস বদলায়। দশ-এগারো বছর বয়সে স্ত্রী হর্সশ্যু ক্র্যাব পূর্ণবয়স্ক হয়ে ডিম দেওয়ার উপযোগী হয়ে ওঠে।

— "শোন, এরা কিন্তু ২০ থেকে প্রায় ৪০ বছর পর্যন্ত বাঁচে।"

— "অ্যাত্তো বছর বাঁচে এরা!"

— "হ্যাঁ রে। গরিব চাষাভুষো মানুষদের মিথ্যে কথায় ভুলিয়ে তেল বিক্রি করা এই হকারের ডেকচিতে তো ছোটো ছোটো রাজকাঁকড়া দেখছিস। এর চেয়েও অনেক বড়ো হর্সশ্যু ক্র্যাব পাওয়া যায়। ৮ ইঞ্চি থেকে প্রায় দু-ফুট লম্বা এক-একটি রাজকাঁকড়ার ওজনই হয় ১ কেজি থেকে ৪-৫ কেজি।"

— "মানুষ কি এই রাজকাঁকড়া খায়?"

— "খায় তো বটেই। থাইল্যান্ডের একটি জনপ্রিয় স্ট্রিট-ফুড হল— ডিম-সহ রোস্টেড হর্সশ্যু ক্র্যাব। তুই যদি ইউ টিউব-এ সার্চ করিস তো দেখতে পাবি খোলস আর পা বাদ দিয়ে বাকি অংশটা কেমন কুড়মুড়িয়ে খাচ্ছে তারা।"

— "বাহ্, রাজকাঁকড়া নিয়ে কতকিছুই শিখলাম আজ।"

— "আরে, তোকে তো আর-একটা বিষয় বলতেই ভুলে গেছি।"

— "কী?"

— "এরা নীল রক্তের প্রাণী। হর্সশ্যু ক্র্যাবের শরীরে হিমোসায়ানিন ও তামা থাকার জন্য এদের রক্তের রং নীল।"

— "হিমোসায়ানিন? সেটা আবার কী?"

— "হিমোসায়ানিন হল এক ধরনের প্রোটিন, যা কিছু প্রজাতির প্রাণীর শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করে। এদের এই নীল রক্তে আর আছে অ্যামিবোসাইটস, যার দ্বারা চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও ওষুধ কতখানি জীবাণুমুক্ত, ল্যাবরেটরিতে তার পরীক্ষা করা হয়।"

বর্তমানে মাত্র চারটি প্রজাতির রাজকাঁকড়া বা হর্সশ্যু ক্র্যাব পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি প্রজাতির দেখা মেলে আটলান্টিক মহাসাগরে। বাকি তিনটি প্রজাতি পাওয়া যায় ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। স্কারসিনোস্কর্পিয়াস রোটানডিকডা প্রজাতির দেখা মেলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমুদ্র-অঞ্চলে। লিমুলাস পলিফেমাস প্রজাতির বাস আমেরিকা-সংলগ্ন আটলান্টিক মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং মেক্সিকো

উপসাগরীয় অঞ্চলে। টেকিপ্লেয়াস গিগাস প্রজাতির রাজকাঁকড়া পাওয়া যায় ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়া, ভারত তথা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। আর টেকিপ্লেয়াস ট্রাইডেন্ট্যাটাস পাওয়া যায় চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, ফিলিপিন্স এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোতে।

হর্সশ্যু ক্র্যাব সম্পর্কে সবচেয়ে অদ্ভুত দুটি তথ্য হল— রাজকাঁকড়ার শরীরের এক তৃতীয়াংশ রক্ত বেরিয়ে গেলেও এরা বেঁচে যেতে পারে, আর বলা হয়, এরা নাকি প্রায় এক বছর না খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে! সুতরাং বুঝতেই পারছ, এত কোটি বছর ধরে এই পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য কতকিছুই-না সহ্য করতে হয়।

এবার রাজকাঁকড়া সম্পর্কে সি. স্মিথের লেখা একটা গল্পের টুকরো অংশ বলে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিই। জুলাইয়ের এক তীব্র গরমের দিনে জলের নীচে যেখানে প্রখর তাপ সেই অর্থে পৌঁছোচ্ছে না, এমন জায়গায় বসে তাদের দাদুর জন্য অপেক্ষা করছিল দুই রাজকাঁকড়া— হারমান আর আর্চি। অপেক্ষা করতে করতে নানা বিষয়ে কথা বলছিল তারা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ছোটোটা অর্থাৎ হারমান বলল, "দাদু এখনও আসছে না কেন? আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব?"

"দু-মিনিট। দেখ, ঠিক দু-মিনিট পরেই চলে আসবে দাদু।"— আর্চি তাকে আশ্বাস দিল।

সত্যিই ঠিক দু-মিনিট পরে তাদের দাদু ফিরে এল। হারমান তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "এই তোমার আসার সময় হল? সেই কখন থেকে বসে আছি!"

— "এই তো এসে পড়েছি, দাদুভাই।"

— "তুমি যে বলেছিলে, আমাদের নিয়ে যে-কিংবদন্তি আছে, তা বলবে?"

— "বলব তো বটেই।"

— "তাহলে বলো।"

— "অনেক অনেক বছর আগে রাজকাঁকড়ারা এই এখনকার মতো সারাসমুদ্রে ঘুরে বেড়াত। সারাদিন ধরে খেত, ঘুমাত, খেলত। কিন্তু তখনকার সঙ্গে এখনকার দিনগুলোর একটা তফাত আছে। তখন রাজকাঁকড়াদের কাছে ছিল একটা বিশেষ উপহার। তারা এই পৃথিবীর সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারত। ওই বিশেষ উপহারের দৌলতে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী ছিল। সকলের ভাষা বুঝত। এই গ্রহের সব রহস্য এবং সব জিজ্ঞাসার উত্তর তাদের জানা ছিল।"

— "সেই জন্যই কি আমরা এত কোটি কোটি বছর ধরে এই বিশ্বে টিকে আছি?"

— "ঠিক বলেছ, হারমান। যাও, এবার ঘুমোতে যাও।"

আর্চি চলে যাওয়ার পর হারমানকে তবুও আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দাদু বলল, "তুমি কী ভাবছ, তা আমি জানি দাদুভাই। ভাবছ তো, সেই বিশেষ উপহারটা আর কি কারও কাছে নেই? তোমায় চুপিচুপি বলছি শোনো, আমি জানি সেই বিশেষ উপহারটা এখন তোমার কাছে আছে। তাই আমরা আরও অনেক বছর এই সমুদ্রে নির্ভাবনায় ঘুরে বেড়াব।" ■

শিখরের কাছাকাছি যারা, যারা উজ্জ্বলতর জীবন-জীবিকার জগতে একদিন পৌঁছোবে অবশ্যই— সেই সম্ভাবনাময়দের নিয়ে এই পাতা। লিখেছেন

সেলিম মল্লিক

খুলে যাচ্ছে দশ দিগন্তের জানালা-দরজা

মেধা ও মনন মানুষকে এই পৃথিবীতে সবার ওপরে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। মানুষের এই প্রতিষ্ঠার একটি গভীর তাৎপর্য আছে, যা অনুধাবন করাটা আজ মনে হয় অনেক অনেক বেশি জরুরি। মানুষ ছাড়াও তো অন্য জীবেরা বেঁচে আছে। তবে বাঁচার জন্য মানুষকে এতসব করতে হয় কেন— কেন তার মেধা ও মননকে বিশেষ মূল্যে বিবেচনা করব আমরা? আসল কথা হল— জীবনধারণ মানুষের কাছে বেঁচে থাকার একটা মাত্রা মাত্র। আরও বহু মাত্রাকে সে জীবনের প্রশ্নে গভীরভাবে দেখতে সমর্থ। এই সামর্থ্য পেয়েছে সে নিজেকে সীমাবদ্ধ না ভাবতে পারার অভিলাষ থেকে। যে-কারণে নিজের প্রাণীদেহকে ছাড়িয়ে মানুষ আশ্চর্য বিস্তৃত আয়তনে নিজেকে আবিষ্কার করেছে। এই বিস্তৃতির ভিত্তিগুলি— মেধা, মনন, কল্পনা, প্রতিভা, উদ্যম, অধ্যাবসায়, আরও অনেক কিছু। এই সমস্তকিছুর আধার যেন শিক্ষা— শিক্ষা এদের সবকিছুকে ধারণ করে মানুষকে গূঢ় অর্থে মানুষ করে তোলে। শিক্ষা নানান উপায়ে পাওয়া সম্ভব। মনীষীরা গোটা জগৎটাকেই শিক্ষাক্ষেত্র ভাবেন। সাধারণেরও তাই ভাবা উচিত। তবু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অপার গুরুত্ব আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। বহু মনীষীর বহু অর্জনের উপাদানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ধারণা ও ব্যবস্থা আজ পরিপুষ্ট। সবচাইতে বড়োকথা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীর মনকে এমন একটা শৃঙ্খলের ভেতরে স্থিত রাখে, যা জীবনের উঠতি-পর্বে আবশ্যিক। আল-আমীন হয়তো সবার জন্যে পারেনি, কিন্তু বাংলা ও বাংলার পার্শ্ববর্তী রাজ্যের পিছিয়ে পড়া সমাজের ছেলেমেয়েদের জন্যে এই কাজটি করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের মানুষের মতো মানুষ করে তুলতে নিরন্তর দশহাতে খুলে দিচ্ছে দশ দিগন্তের সব ক-টা জানালা-দরজা।

এই বিভাগে প্রথমেই যাকে নিয়ে কথা বলব, সে আতাবুর রহমান মোল্লা। ২০০০ সালের জাতক আতাবুর। তার জন্মসাল দেখে বুঝতেই পারছি, সে এক নতুন শতাব্দীর ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাবে জীবনের পথে। এ এমন এক সংকেত, একে যদি জীবনের গভীর গভীরতর কোনো তাৎপর্যরূপে গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তবে হয়তো এটাই প্রেরণার বড়ো ভূমিকা নিতে পারে। তার জন্ম দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানা অঞ্চলের ভাঁটিপোতা গ্রামে। আতাবুরের বাবা সাহালোম মোল্লা লেখাপড়া করেছেন ক্লাস ফোর পর্যন্ত। চাষবাস তাঁর জীবিকা। নিজেদের অল্প কিছু ধানি জমি আছে, সেখান থেকে অল্প উপার্জন করে কোনোক্রমে সংসার-নির্বাহ করেন। মা মাসকুরা বিবি ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন, তিনি গৃহবধূ। আতাবুরের এক বোন আছে, যে দশম শ্রেণির ছাত্রী।

> তানিয়া ইসলাম। দশম শ্রেণি পর্যন্ত মিশনের পাথরচাপুড়ি শাখার ছাত্রী ছিল। সেখান থেকে ২০১৮ সালে ৬৬৭ (৯৫.৩%) নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাস করে। পদার্থবিজ্ঞান ও জীবনবিজ্ঞান— উভয় বিষয়ে পেয়েছিল একশোর মধ্যে একশো।

প্রাইমারি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সে গ্রামের বেসরকারি স্কুলে পড়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে আল-আমীনের ছাত্র। প্রথমে ভর্তি হয়েছিল মিশনের উনসানি শাখায়। সেখান থেকে ২০১৮ সালে মাধ্যমিক দিয়ে পেয়েছে ৬৬৮, অর্থাৎ ৯৫.৪ শতাংশ নম্বর। গণিতের প্রাপ্ত নম্বর সর্বোচ্চ— একশোর মধ্যে একশো। এখন উলুবেড়িয়া শাখার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। মিশনে পড়ার শুরুর থেকেই মিশন তাকে বিশেষ সাহায্য করে আসছে। দশম শ্রেণি পর্যন্ত খুব অল্প ফিজ দিয়েই লেখাপড়া করতে পেরেছে। এখন তো কোনো অর্থই দিতে হয় না। জীববিদ্যা প্রিয় বিষয়। এবং ভবিষ্যতে ডাক্তারি পড়াই তার সহজ প্রবণতা।

মিশনের যে-বিশিষ্টতা তার সবচাইতে সহায়ক বলে মনে হয়েছে, তা হল, মিশনের শিক্ষকদের সবসময়ের সান্নিধ্য আর ঘরোয়া পরিবেশ। এখানে সবাই মিলে যেন একটা বিরাট পরিবারের মধ্যে আদরে-যত্নে পাশাপাশি মানুষ হচ্ছে— আতাবুরের বিশ্বাস, যেকোনো পড়ুয়ার কাছে, এরকম লেখাপড়া করার পরিবেশ পাওয়াটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। আতাবুরের

বিশেষ ভালো লাগার বিষয় হল জীবনানন্দ দাশের কবিতা। তবে ভূতের গল্প শুনতেও তার বেশ পছন্দ— কেমন একটা গা-ছমছমে অনুভূতি হয়, যা বেশ উপভোগ্য।

এ-বার আসি এক ছাত্রীর কথায়। তানিয়া ইসলাম। বীরভূম জেলার মুরারই থানার চৈতি গ্রামে তার বাড়ি। জন্ম ২০০৩ সালে। বাবা গোলাম রসুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। মা আক্তারা বেগম গৃহবধূ। তানিয়ার এক দিদি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রী। তানিয়ার লেখাপড়ার শুরু সরকারি প্রাইমারি স্কুলে। তারপর ক্লাস ফাইভ থেকে মিশনে। দশম শ্রেণি পর্যন্ত মিশনের পাথরচাপুড়ি শাখার ছাত্রী ছিল। সেখান থেকে ২০১৮ সালে ৬৬৭ (৯৫.৩%) নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাস করে। পদার্থবিজ্ঞান ও জীবনবিজ্ঞান— উভয় বিষয়ে পেয়েছিল একশোর মধ্যে একশো। এখন উলুবেড়িয়া শাখায় দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ছে। ২০২০ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। ডাক্তারি পড়তে চাওয়া তানিয়া ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস অসুখের ওপর বিশেষভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করার মতো প্রশিক্ষণ নিতে চায়। তাদের পরিবারের প্রায় সকলকে এই অসুখ যেভাবে আক্রান্ত করেছে, এই অসুখের অভিশাপ থেকে মানুষকে যতটা সম্ভব উদ্ধার করা যায়, তানিয়া তারই চেষ্টা চালিয়ে যাবে আজীবন।

মিশনে ভর্তির প্রসঙ্গে সে জানাল, এক সম্পর্কিত দিদিকে দেখে এখানে পড়তে আসার প্রেরণা পায়। তবে এখানে পড়তে না এলে হয়তো এত সহজে এত সাহসের সঙ্গে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখতে পারত না বলে সে মনে করে। নিজের শখ-আহ্লাদের কথা বলতে গিয়ে বার বার বলছিল, তার ছোটোবেলার গান শেখার কথা। মনের গহনে সুরের সৌন্দর্য সে প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করে।

সহিদুল ইসলাম। এও মিশনের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। এবং এরও শাখা উলুবেড়িয়া। সহিদুলের জন্ম ২০০২ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানার নওপাড়া গ্রামে। তার বাবা নজরুল ইসলাম, সহিদুল যখন দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র, তখন মস্তিষ্কের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মা সার্জিনা বিবি আশাকর্মী। সহিদুলের এক দিদি ও এক দাদা। সে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত গ্রামের সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করেছে। তারপর সপ্তম শ্রেণি থেকে আল-আমীন মিশনের ছাত্র। উনসানি শাখা থেকে ২০১৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে

৯৪.৯ শতাংশ, অর্থাৎ ৬৬৪ নম্বর পায়।

ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়াতে তার তেমন আগ্রহ নেই। সে মনে করে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অংশ নিতে পারাটা আজকের দিনে জরুরি। এই ধরনের কাজের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে এই সময়ে। তার মায়ের ইচ্ছে, সে যেন নিজের পছন্দমতো কাজকেই লক্ষ্য করে পড়াশোনায় এগিয়ে যায়। পরিবারের পক্ষ থেকে এমনতরো স্বাধীনতা দেওয়া আজকের ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের প্রতি বিশেষ আগ্রহী বাবা-মায়ের দিক থেকে একটা বড়ো কথাই বটে।

মিশন শুরু থেকেই তাকে বিশেষ সুবিধে দিয়ে আসছে। এখন যেমন সে সম্পূর্ণ বিনা বেতনে লেখাপড়া করছে। তারচেয়েও যে-ব্যাপারটিকে সে গুরুত্ব দিল কথা বলার সময়— মিশন হল বাড়ির মতো নয়, বাড়িই। এত যত্ন হয়তো বাড়িতেও পাওয়া সম্ভব নয়। তার ওপর খুব সহজভাবে একটা নিয়মানুবর্তিতা, যা পড়ুয়াদের লেখাপড়ায় গভীর অর্থে যুক্ত থাকতে প্রেরণা দেয়। বাকিটা নিজের সংগ্রাম। মিশন সেই সংগ্রামে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে নিরন্তর।

এ-বারের মতো শেষ যাকে নিয়ে কথা বলব। বলাই বাহুল্য, সেও মিশনের উলুবেড়িয়া শাখার ছাত্রী। এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে এখন পড়ছে। অর্থাৎ ২০২০ সালে এও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। নাম আশিকা সুলতানা। মালদার কালিয়াচক থানার শেরপুরে ২০০১ সালে জন্ম আশিকার। তার বাবা আবুল হায়াত, অসুস্থতার কারণে কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন। আগে রেশমের ব্যাবসা করতেন। মা ফেরদৌসি বিবি গৃহবধূ। বোঝাই যাচ্ছে, আর্থিকভাবে এই পরিবার বেশ সংকটজনক অবস্থাতেই আছে। এবংবিধ পরিস্থিতিতে বাড়ির ছেলে-মেয়েদের আজকের দিনে লেখাপড়া, অন্তত ভালো করে পড়ানোটা বেশ শক্ত। আশিকার কথায় যা জানা গেল, মিশন এ-বিষয়ে তার জন্য যেভাবে সহায়ক হয়েছে, তা কল্পনাতীত। এখন তো সম্পূর্ণ বিনা বেতনের ছাত্রী আশিকা।

আশিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ নিজের গ্রামে। বাড়ির কাছাকাছি একটা সরকারি প্রাইমারি স্কুলে। তারপর পঞ্চম শ্রেণি থেকে আল-আমীনে। প্রথমে বেলপুকুর শাখাতে। সেখান থেকেই ২০১৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছে ৬৬৪, অর্থাৎ ৯৪.৮৬ শতাংশ নম্বর। অঙ্ক ও জীবনবিজ্ঞান, দুটো বিষয়েই ৯৯ নম্বর পেয়েছে। ২০২০ সালে দেবে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা। এখন মিশনের উলুবেড়িয়া শাখার ছাত্রী। পদার্থবিদ্যা আশিকার প্রিয়তম বিষয় হলেও, সে ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়।

নিজের কথা বলতে বলতে সে জানাল, তার প্রাইমারি স্কুলের হেড-মাস্টারমশাইয়ের প্রেরণায় মিশনে পড়তে আসা। এখানে না এলে অজানা থেকেই যেত একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান ও পরিকাঠামো কত সুন্দর হতে পারে। কল্পবিজ্ঞানের গল্প পড়তে আর স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে আশিকা। কল্পবিজ্ঞানের গল্পের মতোই আশ্চর্য সার্থক পরিণতি একদিন নিশ্চয় পাবে তার স্বপ্ন ও কল্পনা। বাস্তবে এদের সবাইকে আমরা সমস্ত অর্থে সফল হতে দেখব— এই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। ■

বিচিত্র এই বিশ্বে কত তথ্য আর তত্ত্ব, তার সীমা নেই শেষ নেই কোনো। এই বৈচিত্র্যের কারণে জগৎ অপার আনন্দময় ও বিস্ময়ের। এসবের কোনোটা সংবাদশিরোনামে আসে, কোনোটা আসে না। এমনই সব গুরুত্বপূর্ণ টুকরো খবর নিয়ে এই পাতা। লিখছেন

ফরিদা নাসরিন

অসুখ চেনার ইতিকথা

কয়েক দিন আগের কথা। আমরা সবাই খবরের কাগজে পড়েছি বা টিভিতে দেখেছি কলকাতার হাসপাতালে হৃদ্‌যন্ত্র প্রতিস্থাপন বা হার্ট ট্রান্সপ্লান্টেশনের খবর। একজনের হার্ট আরেক জনের শরীরে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বেশ কয়েক বছর আগেই চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এই অস্ত্রোপচার সফলভাবে করেছেন। কী করে চিকিৎসাকে এই জায়গায় আমরা আনতে পারলাম? নানা গবেষণা করে।

ধরা যাক, জন্ডিস হয়েছে কারো। কী করে নিশ্চিত হওয়া যাবে? রক্ত পরীক্ষা করে। বেশিরভাগ অসুখই ধরা পড়ে কোনো-না-কোনো পরীক্ষায়। কত রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা রয়েছে। অনেকেরই জানা পরীক্ষাগুলো হচ্ছে— কফ, রক্ত, পেচ্ছাব, পায়খানা, টিস্যু বা কোষ, এক্স-রে, সি টি স্ক্যান, এম আর আই, ই সি জি, ইকোকার্ডিয়োগ্রাফি, অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি, অক্সিজেন স্যাচুরেশন, মান্টু টেস্ট। আরও কত কী।

পাড়ার একটা লোক এসে সিরিঞ্জে একটু রক্ত নিল। রক্তের কিছুটা টিউবে ভরে এবং একফোঁটা রক্ত কাচের স্লাইডে ঘষে হালকা লালচে করে লাগিয়ে নিয়ে চলে গেল। কাছাকাছিই একটা প্যাথ ল্যাবে সে হয়তো কাজ করে। সেখানে একজন ডাক্তারবাবু আছেন। তাঁকে প্যাথলজিস্ট বলে। তিনি মাইক্রোস্কোপে ওই স্লাইডটি দেখে রিপোর্ট লিখলেন। রিপোর্ট দেখে চিকিৎসক গম্ভীর মুখে জানিয়ে দিলেন— বিলিরুবিন বড্ড বেশি। আপাতত পনেরো দিন রেস্ট। যা লিখে দিচ্ছি, তা-ই খাবেন। আর এই ওষুধগুলো।

এই ব্যবস্থায় পৌঁছোতে হাজার হাজার বছর মাথা ঘামাতে হয়েছে মানুষকে। অসুখ হলে একটা সময় সারাদুনিয়ার মানুষ মনে করত, বোধ হয় কোনো বায়ু-বাতাস লেগেছে। অথবা এসব পাপের ফল, সৃষ্টিকর্তা সেই পাপের শাস্তি দিচ্ছেন। এখনও কোনো কোনো বন্য জাতি বা কোনো সভ্য জগতের মানুষেরও মনে এমন কুসংস্কার লুকিয়ে রয়েছে। এই কুসংস্কারে প্রথম আঘাত হানেন একজন গ্রিক— হিপোক্রাতস বা হিপোক্রাটস। জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০ অব্দে। মৃত্যু খ্রিস্টপূর্ব ৩৭০ অব্দে। তিনি ছিলেন তাত্ত্বিক চিকিৎসক। প্রায় তেইশশো বছর আগে তিনিই প্রথম প্রমাণ-সহ বলেন, মানুষের অসুখের সঙ্গে কোনো দৈব কারণ যুক্ত নয়। অসুখ হয় প্রাকৃতিক কারণে। তবে নিখুঁত বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাপদ্ধতির আবিষ্কর্তা আরব এবং পারস্যের মনীষীরা। এবং পরে ইতালীয় রেনেসাঁ যুগে। পৃথিবীর নানা দেশের কত কত পণ্ডিত আর বিজ্ঞানীর শ্রম লেগে আছে আজকের আধুনিকতম চিকিৎসাপদ্ধতি জানতে। যেমন কেউ মারা গেলে মৃত্যুর কারণ জানতে পোস্টমর্টেম করা হয় এবং এখনও বহু মানুষের মনের কোণে এমন বিশ্বাস লুকিয়ে আছে যে, এসব ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। কিন্তু আমরা কি জানি, পৃথিবীতে পোস্টমর্টেমের জনক কে? অনেকেই জানি না। তিনি এক আরব এবং তাঁর নাম ইবন রুশদ। আন্দালুসিয়ায়— বর্তমান স্পেন— সেভিলে (জন্ম ১০৯৩, মৃত্যু ১১৬২) ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র। ছিলেন প্রধানত শল্য-চিকিৎসক।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে আর-একজনের অবদান তুলনারহিত। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ইবন সিনা। ছিলেন পারস্যের সন্তান। জন্ম বুখারায় (৯৮০—১০৩৭), বর্তমান উজবেকিস্তানে। তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'আল কানুন ফিত-তিব্ব', যা 'দি ক্যানন অফ মেডিসিন' নামে বিখ্যাত, অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পড়ানো হত ইয়োরোপ-সহ পৃথিবীর নানা শিক্ষাকেন্দ্রে। এই বইটি আজও এতই গুরুত্বময় যে, ১৯৭৩ সালে নিউ ইয়র্ক থেকে ফের প্রকাশ করা হয়। যেমন প্যাথলজিতে মাইক্রোস্কোপের ব্যবহারের জনক— যাকে মাইক্রোস্কোপিক প্যাথলজি বলা হয়— এক জার্মান চিকিৎসক রুডলফ

ভার্কো (১৮২৯—১৯০২)। তাঁকে আধুনিক প্যাথলজির জনক বলা হয় যেমন, তেমনই বহুমুখী কর্মকাণ্ডে যুক্ত এই মানুষটি 'পোপ অফ মেডিসিন' নামেও অভিহিত হয়ে থাকেন।

অত্যাধুনিক পৃথিবীতে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি, ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি এবং মলিকিউলার বায়োলজি চিকিৎসাক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে, যেসবের সাহায্যে বায়োমেডিকেল সায়েন্টিস্টরা রোগকে আরও নিখুঁতভাবে নির্ণয় করতে পারেন।

রাজকাহিনি

সস্ত্রীক জাপ-সম্রাট আকিহিতো। পৃথিবীর প্রাচীনতম রাজপরিবারের বর্তমান বংশধর।

'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'— এমন একটা রবীন্দ্রসংগীত আমরা সবাই শুনি। কেউ কেউ নিজের মনে গাইও। এই রাজাটি কে? রবীন্দ্ররচনায় এর তাৎপর্য আলাদা। কিন্তু বর্তমান ভারতে আমাদের কোনো রাজা নেই। আমরা গণতান্ত্রিক দেশে বাস করি। তাই, অন্তত কাগজে-কলমে আমরা সবাই রাজা। কিন্তু পৃথিবী থেকে রাজারা কি সত্যিই বিদায় নিয়েছেন? না। বহু দেশেই এখনও রাজতন্ত্র টিকে রয়েছে। কোথাও আনুষ্ঠানিকভাবে, কোথাও সমেজাজে, মানে সম্পূর্ণ ক্ষমতা-সহ। কতগুলো রাষ্ট্র রাজা বা রানির শাসনে এখনও রয়েছে?

হিসেব করে দেখলে পৃথিবীতে এখনও ভ্যাটিকান সিটি-সহ মোট একচল্লিশটি দেশে— সম্পূর্ণ ক্ষমতা-সহই হোক অথবা নিয়মতান্ত্রিকভাবে— রাজতন্ত্র টিকে রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ইউনাইটেড কিংডম বা গ্রেট ব্রিটেন-সহ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথই মোট ষোলোটি দেশের আনুষ্ঠানিক রানি। এই দেশগুলো এককালে সব ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত। যেমন অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, পাপুয়া নিউগিনি, নিউজিল্যান্ড, জামাইকা ইত্যাদি। কিন্তু সব রাজা বা রানি এমন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান নন। এখনও বহু শাসক রয়েছেন, যাঁরা প্রকৃত প্রস্তাবে সাম্রাজ্যের প্রধান। যেমন সৌদি আরবের রাজা কিং সালমান। এখন সারাবিশ্বে মাত্র ছ-টি রাষ্ট্র রয়েছে, যে-রাষ্ট্রগুলো সম্পূর্ণ এককভাবে রাজা বা রাজপরিবার কর্তৃক শাসিত। ভ্যাটিকান সিটি, সৌদি আরব, ওমান, সোয়াজিল্যান্ড, ব্রুনেই এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। সৌদির রাজার নাম আগেই বলেছি। ভ্যাটিক্যানের শাসক পোপ, ওমানের রাজা সুলতান কাবুস ইবন সায়িদ, সোয়াজিল্যান্ডের রাজা তৃতীয় মিসওয়াতি, ব্রুনেইয়ের রাজা এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির রাজা। বাকি উনচল্লিশটি রাজার ক্ষমতা কোথাও পার্লামেন্ট দ্বারা সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ, কোথাও-বা আংশিক। যেমন কাতার, বাহ্‌রাইন, জর্ডন, মালেশিয়া বা মরক্কোর রাজারা একক ক্ষমতাধর না-হলেও নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক বা বেলজিয়ামের মতো ইয়োরোপীয় রাজা-রানিদের থেকে কিছু বেশি শাসনক্ষমতা তাঁদের হাতে রয়েছে।

দুনিয়ার প্রাচীনতম রাজবংশ কোনটি? এর উত্তর খুব সহজ। জাপান। কথিত আছে, ৬৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জিম্মু এই রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই, তবু ওই সালের এগারো ফেব্রুয়ারি দিনটি জিম্মুর সিংহাসনে আরোহণের দিন হিসেবে জাপানিরা পালন করে আসছে। যদিও ১২৫-টি রাজার কথা জাপানিরা বলে, কিন্তু রাজপরিবারের দলিলে চতুর্থ শতকের সম্রাট ওজিন থেকে শুরু হয়েছে রাজপরিবারের ইতিহাস। বর্তমান সম্রাট আকিহিতো ১৯৮৯ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। যতই নিয়মতান্ত্রিক রাজা হোন, ২৬৭৮ বছর ধরে একই বংশের শাসনের ফলে জাপান এ-ব্যাপারে শীর্ষস্থানে রয়েছে।

এর পরেই রয়েছে কম্বোডিয়া। সে-দেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় ৬৮ খ্রিস্টাব্দে। একনাগাড়ে প্রায় ২০০০ বছর শাসন করছে একই বংশ। আমরা রূপকথা থেকে রাজা-মহারাজাদের ধনরত্নের গল্প অনেক শুনেছি বা পড়েছি। এখনকার রাজাদের ধনরত্ন বা সম্পদ কেমন? এ-ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা মুশকিলের। কেননা, পেট্রোলিয়ামের দাম ওঠা-নামায় সম্পদ বাড়ে-কমে। তবু 'ফোর্বস' পত্রিকার ২০১১ সালের এক হিসেবে জানা যাচ্ছে, স্থিরভাবে সবচেয়ে ধনী থাইল্যান্ডের রাজা ভূমিবল অদুল্যদেজ। তাঁর নিজস্ব সম্পদের পরিমাণ ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই সম্পদের মধ্যে রয়েছে ব্যাংকক শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ এক হিরে। দ্বিতীয় স্থানে আছেন ব্রুনেইয়ের সুলতান হাসান আল বলকিয়াহ্। তিনি ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মালিক। তেল ও গ্যাস কোম্পানি থেকে এই সম্পদ এসেছে। বলতে কী, দুনিয়ার বৃহত্তম প্রাসাদে সুলতান থাকেন এবং তাঁর আড়াইশোটি রোলস রয়েস গাড়ি রয়েছে। তাহলে কি আরবরা পিছিয়ে গেল? না। তবে আরব জাহানের সব রাজা এবং আমিরকে হটিয়ে সবার ওপরে রয়েছেন দুবাইয়ের সেখ আহমেদ বিন সায়িদ আল মাখতৌম। তাঁর সম্পদ থাইল্যান্ডের রাজার

ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। এখনও দুনিয়ার ১৬-টি দেশের আনুষ্ঠানিক রানি।

থেকেও বেশি— মোট ৩১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মাখতৌম এমিরেটস গ্রুপ, দুবাই ওয়ার্ল্ড, নুর ব্যাঙ্ক, নুর তাকাফুল ইন্সিয়োরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সদস্য। ■

আল-আমীনের নানা আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে লেখাপড়া করছে দুঃস্থ পরিবারের অজস্র মেধাবী ছেলেমেয়েও। আল-আমীনের আশ্রয় না পেলে হয়তো হারিয়ে যেত তারা। কেমন আছে এই কচিকাঁচারা, যারা একদিন দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে বলে আল-আমীনের বিশ্বাস? নিজেই বলছে কোটবাড় ক্যাম্পাসের দশম শ্রেণির ছাত্র

হুজায়ফা আলি

ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই

- তোমার বাড়ি কোথায়?
- পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার কাঁসাই নদীর কোলে উদয়পুর গ্রামে।
- তোমার আব্বা-মা ও বাড়ির কথা একটু বলো।
- আমার আব্বা আইনাল আলি, রাজমিস্ত্রি। মা রাবিয়া বিবি, একজন গৃহবধূ। আমার কোনো ভাই-বোন নেই। আমাদের কেবল একটি মাটির ঘর আছে। পাশে ছোটো একটা পুকুর।
- মিশনে কী করে ভর্তি হলে?
- প্রথমে অন্য মিশনে পড়তাম। পরীক্ষার শেষে যখন বাড়ি গেলাম, মা বলল, 'তোকে আল-আমীন মিশনে ভর্তি করব।' তারপর পরীক্ষা দিলাম এবং অবশেষে ১৯.০১.২০১৮-তে মিশনে ভর্তি হলাম।
- পুরোনো স্কুল কেমন ছিল?
- আমাদের পুরোনো স্কুলের পরিবেশ ভালো ছিল। চারিদিকে ভর্তি গাছপালা ছিল। খেলাধুলার বড়ো মাঠ ছিল।
- বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়া এবং মিশনে পড়ার প্রভেদ কেমন?
- বাড়ির বা মিশনে পড়ার চেয়ে আল-আমীন মিশনে পড়া অনেকটা ভালো। বেশ অন্যরকম।
- এখানের ভালো-মন্দের ব্যাপারটা কেমন একটু বলবে?
- এখানে পড়ানোর দিক, পরিবেশের দিক, খাবারের দিক— সব দিক থেকেই ভালো। কিন্তু গরম কালে আমাদের প্রচুর গরম লাগে।
- মিশনে না এলে কী করতে?
- মিশনে না এলে অন্য মিশনে যেতাম বা অন্য কোনো হাই স্কুলে পড়তাম।
- কী হতে চাও এবং কেন?
- আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই। ইঞ্জিনিয়ার হলে ইলেকট্রনিক্স জিনিস কীভাবে তৈরি করা হয়, সেটা জানব।

প্রিয় বিষয়: গণিত।
প্রিয় মানুষ: মা ও বাবা।
প্রিয় জায়গা: আমার বাড়ি।
প্রিয় সময়: সকাল।
প্রিয় লেখক: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
প্রিয় কবি: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
প্রিয় রং: নীল।
প্রিয় খাবার: সবই ভালো লাগে।

- মিশনের এই শাখাকে কত ও কেন ভালোবাস?
- এই শাখাকে অনেক ভালোবাসি। কারণ, এখানকার শিক্ষকগণ আমাদের দেখাশোনা করেন এবং এখানকার নিয়ম খুব কঠিন।
- মাধ্যমিকে কেমন রেজাল্ট করতে চাও?
- আমি মাধ্যমিকে নব্বই শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেতে চাই।
- কোন আবিষ্কার তোমার প্রিয়?
- বৈদ্যুতিক যেকোনো জিনিস।
- এখন কী আবিষ্কার করা জরুরি?
- রোবট দিয়ে পরিশ্রমের কাজ করানো।
- আল-আমীন মিশন নিয়ে তুমি কী ভাব?
- মিশন পশ্চিমবঙ্গে থাকার ফলে মুসলিম সমাজের অনেক উন্নতি হয়েছে।
- সিলেবাস বাদে আর কী কী পড়তে ভালো লাগে?
- সিলেবাস বাদে গোয়েন্দা গল্প পড়তে ভালো লাগে।
- শুধু পড়া আর পড়া ... পালিয়ে যেতে চাও না?
- পড়া থেকে কখনো পালিয়ে যাওয়া যায় না, কারণ, যেখানেই যাই-না-কেন, সেখানেও পড়া আছে। ■

সব পরিবারেরই কিছু বলবার কথা থাকে, যে-কথা সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়। আল-আমীন পরিবারেরও আছে তেমন কিছু কথা, কিছু খবর। এই বিভাগে সেইসব সমাচার।

কোটবাড় শাখায় গার্লস ক্যাম্পাস

গত ২০১৮ সালের ১৯ জানুয়ারি কোটবাড় শাখা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় আল-আমীনের শিক্ষা-অভিযানের শুরু হয়। এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই, গত ১৫ জানুয়ারি ওই শাখায় গার্লস ক্যাম্পাসের শুভ উদ্‌বোধন করেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। তাঁর কথায় বার বার উঠে আসছিল মিশন প্রতিষ্ঠায় প্রাথমিক পর্বের কঠিন সংগ্রামের কথা, সেই সময় তাঁর সঙ্গীসাথি ও পৃষ্ঠপোষকদের কাহিনি। কোটবাড় শাখার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হাজি সেখ সফিরুদ্দির প্রচেষ্টায় মাত্র চার-পাঁচ মাসের মধ্যে গার্লস ক্যাম্পাসের হস্টেল বিল্ডিং-সহ সবকিছুই সুচারুরূপে গড়ে ওঠায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। মিশনের প্রতি রাজ্যবাসী ও শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া সমাজের আস্থা-অনুরাগের কথাও তিনি তুলে ধরেন। মিশনের বেশ কিছু কৃতী ছাত্র-ছাত্রীর অভাবনীয় সাফল্যের কথা উপস্থিত অভিভাবক ও পড়ুয়াদের শোনান তিনি। ছোটো বিষয়কে ছোটো করে দেখে মূল লক্ষ্য শিক্ষার্জন ও জীবনে প্রতিষ্ঠা হওয়াকে বড়ো করে দেখার জন্য তিনি ছাত্রীদের উপদেশ দেন। আগামী দিনে এই শাখায় উচ্চ-মাধ্যমিকের কলা বিভাগ শুরুর ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, গত বছর থেকেই এই শাখায় পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রদের এবং এ-বছর আলাদা গার্লস ক্যাম্পাসে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে শিক্ষানুরাগী এলাকাবাসী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাজি সেখ সফিরুদ্দি, মিশন পরিবারের সদস্য মহম্মদ আলমগীর বিশ্বাস, সমাজসেবী ও মিশনবন্ধু মহম্মদ খয়রুদ্দিন খান, এই শাখার সুপারিন্টেনডেন্ট মহম্মদ ইমরান মল্লিক প্রমুখ।

তিন জেলায় ক্যাম্পাস উদ্‌বোধন

আল-আমীনের ক্যাম্পাসশূন্য জেলার তালিকা থেকে দু-বছর আগে গত ২০১৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি কোচবিহারের নাম বাদ পড়েছে। ওই দিনে কোচবিহার-১ ব্লকের ঘুঘুমারির হাওয়ারগাড়ি গ্রামে আল-আমীন মিশন একাডেমি, কোচবিহার শাখার পথ চলা শুরু হয় । শিক্ষানুরাগী হাজি হানিফউদ্দিন মিয়াঁর বাড়িতেই অস্থায়ীভাবে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির কয়েক জন পড়ুয়া নিয়ে শুরু হয়েছিল এই প্রচেষ্টা। দু-বছর পর গত ১২ জানুয়ারি হানিফউদ্দিন মিয়াঁর দান করা সাড়ে ছ-বিঘে জমির ওপর নবনির্মিত বয়েজ ক্যাম্পাসের উদ্‌বোধনের পাশাপাশি ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীদের নিয়ে, বয়েজ ক্যাম্পাসের বেশ দূরে শুরু হয়েছে গার্লস শাখাও।

এই শুভক্ষণে মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম বলেন, পিছিয়ে পড়া সমাজের অভাবী মেধাবীদের দেশ ও দশের সেবার যোগ্য করে তোলার কাজ পাগলরাই মনের সুখে করে থাকে। তিনি বলেন, বেলপুকুর শাখার সুপারিন্টেনডেন্ট মাইনুদ্দিন আহমেদ-সহ এই শাখার তরুণ ইনচার্জ হারুনও সেরকমই পাগল। তিনি আরও বলেন, দক্ষিণবঙ্গে মিশনের বিস্তারের তুলনায় উত্তরবঙ্গ পিছিয়ে থাকলেও, মনে রাখতে হবে বেলপুকুর শাখার মহ. আরিফ শেখ ২০০৭ সালে মাধ্যমিকে প্রথম স্থান অধিকার করে। উপস্থিত গ্রামবাসী ও অভিভাবকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, এই শাখাও ধীরে ধীরে মিশনের অন্যান্য শাখার মতো মেধাবী ছেলেমেয়ের লালনাগার হয়ে উঠবে ইনশা আল্লাহ্। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক হাজি হানিফউদ্দিন মিয়াঁ, ডিস্ট্রিক্ট ল অফিসার শামিম রহমান, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আব্দুস সাত্তার, মাইনুদ্দিন আহমেদ, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আফতাবুদ্দিন প্রমুখ।

উল্লেখ্য, গত ১১ জানুয়ারি মালদা জেলার কালিয়াচক থানা এলাকায় আল-আমীন একাডেমি, সাহাবাজপুর শাখার শুভ উদ্‌বোধন করেন এম নুরুল ইসলাম। তিনি বলেন, দিন প্রতিদিন মিশনের প্রতি সমাজের আস্থা বাড়ছে এবং সেইসঙ্গে বাড়ছে মিশনে নিজ ছেলেমেয়ে ভর্তির জন্য অভিভাবকদের আকাঙ্ক্ষা। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও প্রত্যেক বছর বিভিন্ন জেলায় নতুন শাখা প্রতিষ্ঠা করে চলেছি। তিনি আরও বলেন, ডিঘরি হাই স্কুলের শিক্ষক শুকুরউদ্দিন শেখ, তাঁর সহযোগী তোহিদুর রহমান ও মহম্মদ আলি খান-সহ এলাকার শিক্ষানুরাগীদের প্রচেষ্টায় ২০১৪ সালে

এখানে এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে তাঁরা আল-আমীনের শিক্ষা-আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এখানে মিশনের একটি শাখা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। সেই ক্রমে আজ এলাকাবাসী ও শিক্ষানুরাগীদের দীর্ঘ দিনের আশা পূরণ হল।

এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মজামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আফরোজা পারভিন, শিক্ষক লুতফুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদ্বয় ওয়াজেদ আলি ও হাসমত আলি, সমাজসেবী হাসমত আলি বিশ্বাস প্রমুখ। ওই দিন উত্তর দিনাজপুর জেলায় আল-আমীন একাডেমি, ইটাহার বয়েজ শাখার উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে এম নুরুল ইসলাম উত্তরবঙ্গের প্রতি মিশনের দায়বদ্ধতার কথা স্বীকার করেন। পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সম্প্রতি ইন্টারভিউয়ের রূপকথা-সম কয়েক জন অভাবী মেধাবীর কথা তুলে ধরেন তিনি। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে এই শাখায় কেবলমাত্র ছাত্ররাই সুযোগ পেলেও পরবর্তীকালে ছাত্রীদের জন্যও আমাদের প্রয়াস জারি থাকবে। তাঁর মতে, একটি সুসংহত সমাজ গঠনের জন্য নারী-পুরুষ উভয়কেই শিক্ষিত ও সমাজমনস্ক হতে হবে। অনুষ্ঠানে বেলপুকুর শাখার সুপারিন্টেনডেন্ট মাইনুদ্দিন আহমেদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় থানার এস.আই., পঞ্চায়েত প্রধান, মিশনের হেমতাবাদ ও কুস্কারি শাখার ভারপ্রাপ্ত শাখাপ্রমুখগণ।

নয়াবাজ শাখায় বার্ষিক অনুষ্ঠান

২৭ ও ২৮ জানুয়ারি আল-আমীন একাডেমি, নয়াবাজ ক্যাম্পাসে বার্ষিক অনুষ্ঠান ও পুনর্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। দু-দিন ধরে পড়ুয়াদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং কৃতীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। শেষ দিন সন্ধ্যায় মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম ছাড়াও বহু বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন অধ্যাপক ড. সুশীলকুমার দাস দীর্ঘ আলোচনায় তাঁর নিজের জীবনের সংগ্রাম ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার কথা তুলে ধরেন। তিনি পড়ুয়াদের উদ্দেশে বলেন, "বিজ্ঞান নিয়ে পড়লে কেবল ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারই হওয়া যায় না, বিজ্ঞানের নানা বিভাগ রয়েছে। প্রত্যেক বিভাগই গুরুত্বপূর্ণ।" এম নুরুল ইসলাম ড. সুশীলকুমার দাসকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, "আমরা তাঁর মূল্যবান বক্তব্য শুনে সমৃদ্ধ হলাম।" তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের উপদেশ দিয়ে বলেন, "জীবনে তোমরা তোমাদের আত্মার কথা শোনার চেষ্টা করো এবং সেইমতো নিজের জীবনকে উজ্জ্বলভাবে গড়ে তোলো।" ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে শিল্পপতি, সমাজসেবক, আইনজ্ঞ হওয়া এবং দেশের আইনসভার গুরুত্ব নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। শুধু সাফল্য নয়, সার্থক মানুষ হওয়াই তোমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মিশনের স্টাডি সার্কলের ডিরেক্টর দিলদার হোসেন সমাজে মিশনের অবদান আলোচনার পাশাপাশি বলেন, শুধু শিক্ষিত হলেই চলবে না, নিজের মধ্যে মূল্যবোধ

গড়া ও সকলকে ভালোবেসে একসঙ্গে পথ চলার ব্রতও গ্রহণ করতে হবে। মিশনের কলকাতা অফিসের আধিকারিক মহম্মদ মহসীন আলি গল্পের মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের গুরুত্ব নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ে বলেন। মিশনের প্রাক্তনী অস্থি-বিশেষজ্ঞ ডা. হিবজুল আলি খান তাঁর শিক্ষাজীবনের চড়াই-উতরাইয়ের কাহিনির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্‌বুদ্ধ করেন। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান প্রদর্শনী, নাটক, কুইজ ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেলপুকুর শাখার সুপারিন্টেনডেন্ট মাইনুদ্দিন আহমেদ, প্রাক্তনী ও ইঞ্জিনিয়ার আলমগীর সেখ, সমাজসেবী আলহাজ গিয়াসুদ্দিন মল্লিক ও সফিউদ্দিন মল্লিক, শিক্ষক গিয়াসুদ্দিন মণ্ডল, নয়াবাজ শাখার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক রবিউল হোসেন খান ও ইনচার্জ খোন্দকার মহিউল হক, শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রবৃন্দ।

ডব্লিউ.বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাফল্য

শুধু ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিং নয়, ডব্লিউ.বি.সি.এস. পরীক্ষাতেও ধারাবাহিক ভালো ফল করল আল-আমীন মিশন। সম্প্রতি ডব্লিউ.বি.সি.এস.-এর গ্রুপ সি-র আটটি বিভাগের মধ্যে মিশন পরিচালিত বারুইপুর ও পাঁচুড়ের

গ্রুপ এ (এক্সি.)
সেলিম হাবিব

গ্রুপ এ
হাসানুল ইসলাম

গ্রুপ সি
আব্দুল সাত্তার

গ্রুপ সি
মহ. জসিমুদ্দিন

আবাসিক ও পার্কসার্কাস ক্লাসরুম ডব্লিউ.বি.সি.এস. কোচিং সেন্টার থেকে মোট ১১ জন সফল হয়েছেন। উল্লেখ্য, গত বছর প্রকাশিত গ্রুপ এ-র ফলেও মিশনের দু-জন সাফল্য পেয়েছিলেন। মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম সফল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-প্রফেসার-সহ বিভিন্ন পেশায় দেশ ও দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে মিশনের প্রাক্তনীরা। প্রশাসনিক স্তরেও মিশনের প্রাক্তনীদের সাফল্যের জন্য বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই ডব্লিউ.বি.সি.এস. কোচিং শুরু করা হয়। একে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পিছিয়ে পড়া সমাজের প্রতিনিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজ্যের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রচেষ্টা বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নিউটাউনে আল-আমীন মিশন ইনসটিটিউট ফর এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিঙের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে এখানেই ডব্লিউ.বি.সি.এস.-এর পাশাপাশি আই.এ.এস./আই.পি.এস.-এর প্রস্তুতির প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

মালদহ জেলার মানিকচক থানার মথুরাপুর গ্রামের শাহিদ আনোয়ার জামান মিশনের প্রশিক্ষণ থেকে এ-বছর জয়েন্ট বিডিও পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর আব্বা সেখ জামাল জামান প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকে তাঁর পড়াশোনা গ্রামের মথুরাপুর বি এস এস হাই স্কুলে। পরবর্তীকালে সল্টলেকের টেকনো ইন্ডিয়া থেকে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশনে বি.টেক. করেছেন। কিন্তু প্রকৌশলের দুনিয়ার চেয়ে সরকারি প্রশাসনের প্রতি আনোয়ার জামানের ঝোঁক তাঁকে এই সাফল্য এনে দেয়। তিনি ২০১৫ সালে মিশনের কোচিঙে ভর্তি হয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ সাবঅর্ডিনেট ল্যান্ড রেভিনিউ সার্ভিস, গ্রেড ১ পদে সফল হয়েছেন প্রান্তিক কৃষক জামসেদ সেখ ও গৃহবধূ শুকজান বিবির পুত্র আকের

আলি সেখ। তাঁদের নিস্তরঙ্গ সংসারে এই সাফল্য খুশির পরশ লাগিয়ে দিয়েছে। আকের আলির বাড়ি নদিয়ার নাকাশিপাড়া থানার বড়গাছি গ্রামে। দুই পুত্র ও এক কন্যা মিলে পাঁচ জনের হিমশিম পরিবারের কর্তা হিসেবে জামসেদ সেখ কিন্তু ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার প্রতি বরাবরই যত্নবান ছিলেন। আকের আলি নাগাদি ওবাইদিয়া হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় ৮৩ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ২০১৪ সালে কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ থেকে ইংরেজিতে সাম্মানিক স্নাতক হন তিনি। ২০১৫ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত তিনি আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ডব্লিউ.বি.সি.এস.-এর কোচিং নিয়েছেন। ২০১৬ সালের মার্চ মাস থেকে আল-আমীন মিশনের প্রশিক্ষণে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে এই বড়ো সাফল্য অর্জন করেছেন তিনি।

নদিয়ার মতিয়ারি গ্রামের শ্রমজীবী পরিবারের সন্তান মহ. জসিমুদ্দিন মণ্ডল ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর অফ কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ফেয়ার বিজনেস প্র্যাক্টিসেস পদে যোগ দিয়েছেন। অন্যদিকে, উত্তর দিনাজপুর জেলার বুদেল গ্রামের আব্দুল সাত্তার, নদিয়ার বেথুয়াডহরির কৃষিজীবী পরিবারের সাম্মানিক রসায়নের স্নাতক মহ. ওয়াহেদ রহমান সেখ এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের বেনাইল গ্রামের আনারুল ইসলাম, তিনজনই জুনিয়র সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সার্ভিস বিভাগে চাইল্ড ডেভলাপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার পদে যোগ দেবেন। উল্লেখ্য, আনারুল ইসলাম মাত্র ছ-বছর বয়সেই তাঁর বাবাকে হারান। তিনি মিশনের ধুলিয়ান শাখা থেকে উচ্চ-মাধ্যমিকের পর সেরামিক টেকনোলজিতে বি.টেক. করেছেন।

আকের আলি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সাবঅর্ডিনেট ল্যান্ড রেভিনিউ সার্ভিস, গ্রেড ১ বিভাগে মিশনের আরও তিনজন নির্বাচিত হয়েছেন। এঁরা হলেন, মুর্শিদাবাদ জেলার স্নাতক মিজানুর রহমান, নদিয়ার ধনঞ্জয়পুর গ্রামের শ্রমজীবী পরিবারের বিজ্ঞানের স্নাতক বাসিদুল আক্তার এবং নদিয়ার আকন্দবেড়িয়া গ্রামের নিম্নবিত্ত প্রান্তিক কৃষক পরিবারের সন্তান সাম্মানিক ইংরেজির স্নাতক হাসনাত মল্লিক। হাসনাত মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক আল-আমীন মিশনে পড়েছেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উস্থি থানার ছোটো মুদির দোকানি আবদুল করিম জমাদার এবং মনোয়ারা বিবির পুত্র হাসিবুর রহমান জমাদার মিশনের মেদিনীপুর শাখা থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করেন। সাম্মানিক পদার্থবিদ্যার স্নাতক হাসিবুর বর্তমানে অ্যাসিসট্যান্ট ক্যানাল রেভিনিউ অফিসার (ইরিগেশন) পদে নির্বাচিত। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বজবজ এলাকার পৌষালি পাত্রও সাফল্য পেয়েছেন মিশনের কোচিং নিয়ে। তাঁর বিভাগ চিফ কন্ট্রোলার অফ কারেকশন্যাল সার্ভিসেস। এই সমস্ত সফলদের অধিকাংশই গ্রামবাংলার প্রান্তিক সমাজের তরুণ-তরুণী, যাঁরা নামমাত্র ফিজে মিশন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। আল-আমীন মিশন স্টাডি সার্কলের ডিরেক্টর দিলদার হোসেন এই ফলে খুশি ব্যক্ত করেছেন। তিনি জানান, ডব্লিউ.বি.সি.এস.-এর জন্য পার্কসার্কাসে ক্লাসরুম কোচিঙে ভর্তি শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, আবাসিক কোচিঙের জন্য মিশনের প্রবেশিকা পরীক্ষা গত ১১ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়।

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সেমিনারে এম নুরুল ইসলাম

গত ২৫ মার্চ ২০১৯ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের বাংলা অনুষঙ্গ আয়োজিত জাতীয় সেমিনারের উদ্‌বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। দু-দিন ব্যাপী সেমিনারের বিষয় ছিল 'Literary Trends of Contemporary Literature: East and West' ('সাম্প্রতিক সাহিত্যিক প্রবণতা: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রেক্ষিতে')।

এম নুরুল ইসলাম উদ্‌বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তাঁর বক্তব্যের শুরুতে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিশেষ ধন্যবাদ জানান সেমিনার ও বাংলা বিভাগের ডিরেক্টর ড. আমিনা খাতুনকে। তিনি স্বীকার করেন যে, সাহিত্যের শিক্ষক কিংবা ছাত্র না হলেও তিনি সাহিত্যের একজন অনিয়মিত পাঠক। তিনি বলেন, সেমিনারের বিষয়টিকে যেভাবেই দেখি-না-কেন, বিষয়টি বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই প্রাসঙ্গিক।

এ-বিষয়ে তিনি একমত যে, ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃতপক্ষে কোনো সীমানা বা সীমাবদ্ধতা থাকে না, এটা সর্বব্যাপী। অনুষ্ঠানে ইংরেজিতে তিনি যে-বক্তব্য রাখেন, তাঁর সারাংশ এই রূপ:

"প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্য বা বৃহত্তর ক্ষেত্রে ভারতীয় সাহিত্য মধ্যযুগে সমৃদ্ধ হতে শুরু করে এবং ঔপনিবেশিক সময়ে এটি গতিপ্রাপ্ত হয়। মধ্যযুগেই ভারতীয় ভাষাগুলি নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে এবং সমৃদ্ধ হয়। সে-কালের এক বিশেষ অবদান সুফি বা মরমি সাহিত্য। সমৃদ্ধশালী ফারসি সাহিত্য ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে সে-সময় বিশেষভাবে আলোকিত ও আলোড়িত করেছিল। ফারসি সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি হাফিজ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের খুবই প্রিয় ছিলেন, যেখানে ১৮৬১ সালে দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এবং আলিগড় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খানও ওই একই বছর জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৫ সালে তিনি মহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি পরবর্তীকালে

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত। তিনি একজন অত্যুৎসাহী সমাজ-সংস্কারক, যিনি অবিভক্ত ভারতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করে একটি মৌলিক ভূমিকা পালন করেন। এ ছাড়াও তিনি সে-সময়ের অগ্রগামীদের মধ্যে অন্যতম, যিনি দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নে শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

আমি দূর বাংলা থেকে এই পবিত্র স্থানে এসেছি। এবং আমি এমন একটি প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছি, যেটি স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের আদর্শের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত এবং যা তাঁর প্রতিষ্ঠান স্থাপনের এক শতাব্দীরও বেশি সময় পরে গড়ে ওঠে। নানা ঐতিহাসিক কারণে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা সামাজিক, মানসিক এবং অবশ্যই আর্থিকভাবে যাপিত জীবনের প্রতিটি বিষয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল। দেশভাগ তথা বাংলাভাগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অগ্রণী অংশকে পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিল, যেটি বর্তমানে বাংলাদেশ নামে পরিচিত। চলে না-যাওয়া এখানের নাগরিকদের অনেকেই হতাশ এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি আশির দশকে, আমরা দৃঢ়ভাবে অনুভব করেছিলাম যে, শিক্ষা এবং একমাত্র শিক্ষাই পশ্চাৎপদতার পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে পারে। মুসলমান সম্প্রদায়কে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমরা হাওড়া জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম খলতপুর থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম। এভাবেই আল-আমীন মিশনের যাত্রা শুরু। সালটা ছিল ১৯৮৬।

স্যার সৈয়দ আহমদ খানের আদর্শ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের উদাহরণ আমাদের অনুপ্রাণিত করে এবং মাত্র ৭ জন ছাত্র নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। আগে উচ্চশিক্ষায় মুসলমানদের অংশগ্রহণ, বিশেষ করে পেশাদার কোর্সগুলিতে আমাদের রাজ্যে ২ থেকে ৩ শতাংশ ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেটি ২০ থেকে ৩০ শতাংশে পৌঁছেছে। আমাদের অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী ও পৃষ্ঠপোষকদের সাহায্য এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় আমরা এই লক্ষ্যে পৌঁছোতে সক্ষম হয়েছি। পশ্চিমবঙ্গ ও প্রতিবেশী রাজ্যে মিশনের এখন ৭০-টি আবাসিক শাখায় ১৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে। আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে ইতোমধ্যেই ২৪০০ জন চিকিৎসক এবং ২৫০০ জন প্রকৌশলী সাফল্য অর্জন করেছে। প্রাক্তন শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। ভারতে এবং বিদেশে অনেকে উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও পাঠরত। এদের মধ্যে অনেকেই আলিগড়েও অধ্যয়ন করেছে এবং এখনও করছে। কয়েক জন শিক্ষকতাও করছে এখানে। আমরা তাদের জন্য গর্বিত। স্বাধীনতার আগে থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে 'আলিগড় আন্দোলন' নামটি বিশিষ্টতা লাভ করে। একইভাবে আল-আমীন মিশনের প্রচেষ্টাও 'মিশন মুভমেন্ট' হিসেবে রাজ্য ও দেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই আন্দোলন আমাদের রাজ্যে আরও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরির সহায়ক হয়েছে।

আমি আন্তরিকভাবে সেই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব স্যার সৈয়দ আহমদ খানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার নাগরিকদের শিক্ষার মাধ্যমে যৌক্তিক চিন্তাভাবনার নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন। এখানে আমি স্যার সৈয়দ আহমদকে উদ্ধৃত করতে চাই, যিনি বলেছেন, 'যখন একটি জাতি শিল্প ও শিক্ষা বর্জিত হয়ে যায়, তখন এটি দারিদ্র্যকে আমন্ত্রণ জানায়। যখন দারিদ্র্য আসে, তখন এটি হাজার হাজার অপরাধকে উদ্দীপ্ত করে।'

পরিশেষে, আমি বলতে চাই যে, আমরা যে-সমাজে বাস করি, সাহিত্য তার আয়না। এটি সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমাদের কবি বলেছেন, 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে'। সমাজের যেকোনো ক্ষেত্রের মতো, শিক্ষাও বিভিন্ন মতাদর্শ থেকে অনুপ্রেরণা নেয় এবং এগিয়ে যায়। সৃষ্টিশীল চিন্তা এবং ধারণার নিয়মিত মিলন ঘটে চলেছে। আমরা আশাবাদী। মানবতার ধার্মিকতার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস আছে আমাদের। যাঁরা পরে আসবেন তাঁরা নতুন ধারণা নিয়েই আসবেন। আমরা অগ্রিম তাঁদের স্বাগত জানাই।

আমি আশা করি, এই দু-দিন সমসাময়িক সাহিত্যের প্রবণতা নিয়ে আলোচনাকারীরা অবশ্যই নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করবেন। আমরা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে কাজ করে, তাঁদের ক্ষমতায়ন ঘটিয়ে, শিক্ষার মাধ্যমে তাঁদের উন্নয়ন ঘটাই। আমি পুনরায় আশা করি, সেমিনারে আপনাদের আলোচনা আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। আল-আমীন মিশনের পক্ষে আমি আন্তরিকভাবে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।"

সেমিনার তথা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের ডিরেক্টর ড. আমিনা খাতুন উপস্থিত অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে সেমিনারের সূচনা করেন। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী অধ্যাপক হাকিম সাইয়েদ জিল্লুর রহমান (চেয়ারম্যান, ইবন সিনা অ্যাকাডেমি), ড. তাহের এইচ পাঠান (আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়), ড. অমিতাভ চক্রবর্তী (দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক এস এস জেবা (আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক সাইয়েদ আহম্মদ আলি (আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়) প্রমুখ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ডিন অধ্যাপক মাসুদ আনোয়ার আলাভি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ভাষণ দান করেন।

সি.বি.এস.ই.-তে সন্তোষজনক ফল

পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু সমাজের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মূল স্রোতে আনার কঠিন কাজ সাফল্যের সঙ্গে তিন দশক ধরে করে চলেছে আল-আমীন মিশন। এবার সেই ধারায় মিশনের ইংরেজি মাধ্যম শাখাগুলিও জড়িত হচ্ছে। উল্লেখ্য, শিলিগুড়ির মিলনমোড়, পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুর ও বিহারের পাটনা শাখার ছাত্র-ছাত্রীরা সি.বি.এস.ই. দশম শ্রেণির পরীক্ষায় এ-বছর প্রথম বার বসেছিল। প্রথম বছরেই মিলনমোড়, খড়্গপুর ও পাটনা শাখা থেকে যথাক্রমে ৪, ২ ও

৯৫.২%
তৌফিক ইসলাম

৯৪%
সাবিত নুমান

৯৩.৪%
ইকরাম ইসলাম

৯২.৪%
মেহেবুব আলম

৯২.৪%
সারতাজ আলি খান

৯২.২%
রাবিয়া বারি

৯১.৮%
সেখ জাহিন মুজাম্মিদ

৮৯%
মহ. মাসুদ রানা

১ জন ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে মিশনের ভালো ফলের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। তিনটি শাখার মোট ৪৮ জনের মধ্যে ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ৭ জন, ৮৫ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ১৯ জন, ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ৩০ জন, ৭৫ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ৪১ জন। সকলেই প্রথম বিভাগে পাস করেছে। মিলনমোড়ের তৌফিক ইসলাম চৌধুরী ৯৫.২ শতাংশ নম্বর পেয়ে মিশনের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। এ ছাড়াও ওই শাখারই সাবিত নুমান ৯৪ শতাংশ, ইকরাম ইসলাম মণ্ডল ৯৩.৪ শতাংশ, মেহেবুব আলম সরকার ৯২.৪ শতাংশ, এবং খড়্গপুর শাখার সরতাজ আলি খান ৯২.৪

৯২.৬%
এম রহমান

৮৮.৪%
মিনহাজ রহমান

৮৮.২%
ইমতিয়াজ আলম

৮৭%
সাবা খুলুদ আলম

শতাংশ, শেখ জাহিন মুজাহিদ ৯১.৮ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। পাটনা শাখার রাবিয়া বাসরি ৯২.২ শতাংশ নম্বর পেয়ে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে। কলকাতাবাসী রাবিয়ার আব্বা মহম্মদ নাকী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হজ কমিটির এক্সিকিউটিভ অফিসার।

উল্লেখ্য, সি.বি.এস.ই. দ্বাদশ শ্রেণির সম্প্রতি প্রকাশিত ফলেও মিশনের রাঁচি বয়েজ ও পাটনা গার্লস শাখা সন্তোষজনক ফল করেছে। ১৮ জন ছাত্র ও ২৭ জন ছাত্রী অর্থাৎ মোট ৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ১ জন, ৮৫ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ৬ জন, ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ১৩ জন, ৭৫ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ২৪ জন এবং ৭০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ৩৪ জন। রাঁচি শাখার মামুনুর রহমান ৯২.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে মিশনের মধ্যে প্রথম হয়েছে। পাটনা শাখার সাবা খুলুদ আলম ৮৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে। সাবা বর্ধমান শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী হাসিব আলমের কন্যা।

মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম এই ফলে স্বভাবতই খুশি। বিশেষ করে, দশম শ্রেণির পরীক্ষায় প্রথম বারের এই ফলে, পরবর্তীকালে আরও ভালো হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, অভিভাবকদের অনুরোধে এ-বছর ইংরেজি মাধ্যমের আরও তিনটি নতুন ক্যাম্পাস চালু হল, বীরভূমের পাথরচাপুড়ি (বয়েজ, ৫ম-৯ম), হাওড়ার পাইকপাড়ি (বয়েজ, ৫ম-৯ম), শিলিগুড়ির আশরফনগর (গার্লস, ৮ম-৯ম)।

২০১৪ সালে চালু হওয়া মিলনমোড় শাখার শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী-সহ ১৫০ জন আবাসিক ছাত্র তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রথম বছরের রেজাল্টে বেজায় খুশি। তারাও ভবিষ্যতে ভালো ফল করবে বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার চুয়াপুকুর গ্রামের পঞ্চায়েত সেক্রেটারি তামিজুদ্দিন চৌধুরী ও গৃহবধূ মেহেবুবা বিবির সন্তান তৌফিক ইসলাম চৌধুরী ২০১৫ সালে এই শাখায় সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। শুধু এই শাখা নয়, মিশনের মধ্যে সে প্রথম হয়েছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৬। সে মনে করে, ভালো ফল করার একমাত্র পথ কঠোর পরিশ্রম এবং আব্বা-মা ও শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা। ওই জেলারই ভগবানগোলা থানার খুলারপুকুর গ্রামের সন্তান সাবিত নুমান। তার আব্বা আনামুল হক একজন এম.এস.কে. শিক্ষক এবং মা সুমাইয়া খাতুন শিক্ষিকা। সাবিত মনে করে, শিক্ষায়তনের পরিবেশ, পরিশ্রম এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সাফল্যের জন্য খুব জরুরি। ভবিষ্যতে একজন চিকিৎসক হয়ে গরিব-বঞ্চিতদের সেবা করার ইচ্ছা তার। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৭০। ইকরাম ইসলাম মণ্ডলের বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনার হাসনাবাদ থানার রাজাপুর। সে পেয়েছে ৪৬৭ নম্বর। তার আব্বা রফিকুল ইসলাম মণ্ডল একজন প্রধান শিক্ষক এবং বর্তমানে বসিরহাট উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক। মিশন পরিবারের যত্ন এবং প্রচেষ্টাই তার সাফল্যের কারণ বলে মনে করে সে। এক সামাজিক চিকিৎসক হয়ে সমাজের সেবা করতে ইচ্ছুক। মেহেবুব আলম সরকারের আব্বা আব্দুল্লাহিল সরকার একজন ওষুধ ব্যবসায়ী এবং মা সেলিনা বিবি গৃহবধূ। মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা থানার মুলিডাঙা গ্রামে বাড়ি তাদের। আল্লাহ্‌র অসীম কৃপা, আব্বা-মার দোওয়া এবং মিশনের শিক্ষকদের প্রচেষ্টায় এই সাফল্য তার। একজন ভালো ডাক্তার হয়ে অবহেলিতদের সেবাই তার লক্ষ্য বলে জানায় সে। সে পেয়েছে ৪৬২ নম্বর।

খড়্গপুর শাখার টপার সরতাজ আলি খান সি.বি.এস.ই. দশম শ্রেণির পরীক্ষায় ৪৬২ নম্বর পেয়েছে। তার আব্বা মুস্তাক আলি খান একজন ছোটো ব্যবসায়ী এবং মা গৃহবধূ। নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল। মিশন কর্তৃপক্ষের আর্থিক সহায়তা পেয়েছে বলে জানায় সে । হাওড়ার পাঁচলা থানার পানিয়ারা গ্রামের সেক সাহাবুদ্দিনের পুত্র সেক জাহিন মুজাহিদও এই শাখায় নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। ৪৫৯ নম্বর পেয়ে সে এই শাখায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

দ্বাদশ শ্রেণির ফলে মিশনের মধ্যে প্রথম হয়েছে রাঁচি শাখার মামুনুর রহমান। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৬৩ (৯২.৬%)। পাকুড় জেলার নয়াগ্রামের বাসিন্দা মামুনুরের আব্বা আব্দুর রহমান একজন সামান্য কৃষিজীবী এবং মা কারুন নাহার গৃহবধূ। ছোটো থেকেই মেধাবী মামুনুর এই শাখায় একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল। বীরভূমের বোলপুরের মিনহাজ রহমান পেয়েছে ৪৪২ নম্বর। নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান খুশতার হাসমি ছোটো থেকেই খুবই কষ্ট করে পড়াশোনা করেছে। তার আব্বা গোলাম হায়দার একজন মাওলানা। তাদের আর্থিক দিক বিবেচনা করে মিশনের তরফে আর্থিক সহায়তা পেয়েছে বলে জানায় মিনহাজ। সে জানায়, তার এই সাফল্যে আব্বা-মা ও মিশনের অবদান সর্বাধিক।

আল-আমীন উৎসব ২০১৯

মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম গত ২৬ জানুয়ারি মিশনের মূল ক্যাম্পাস খলতপুরে দু-দিনের আল-আমীন উৎসবে আগত অতিথি ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্বাগত জানান। ওই দিন সকালে মিশনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও এ-দিনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। তিনি বলেন, ৩৩ বছর আগে শুরু হওয়া এক নতুন ভাবনার নাম আল-আমীন মিশন। বর্তমানে আবাসিক পড়ুয়ার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় ষোলো হাজার, যার মধ্যে এক চতুর্থাংশের খরচ জাকাত ও দানের অর্থে চলে। এটা অনস্বীকার্য, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাংলার সমাজে সংখ্যালঘুদের গুরুত্ব ছিল একেবারে ন্যূনতম। তিন দশকে সে-অবস্থা অনেকটাই পালটেছে। কিন্তু এখনও এমন বহু মানুষ আছেন, যাঁরা সত্যিকার অর্থেই পিছিয়ে আছেন। আমরা যাঁরা প্রতিষ্ঠিত ও ভালো আছি, তাঁদের সেইসব বঞ্চিতদের টেনে তুলতে হবে এবং মিশনের সুযোগ ও সুবিধার কথা তাঁদের কাছে পৌঁছোতে হবে। শিক্ষার পাশাপাশি গ্রামীণ মানুষদের স্বাস্থ্য-পরিষেবা পৌঁছে দিতে খলতপুরের মতো মিশনের অন্যান্য শাখায় হেলথ সেন্টার খোলা হবে বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠানের প্রধান

৩৩ বছর আগে শুরু হওয়া এক নতুন ভাবনার নাম আল-আমীন মিশন। বর্তমানে আবাসিক পড়ুয়ার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় ষোলো হাজার, যার মধ্যে এক চতুর্থাংশের খরচ জাকাত ও দানের অর্থে চলে। এটা অনস্বীকার্য, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাংলার সমাজে সংখ্যালঘুদের গুরুত্ব ছিল একেবারে ন্যূনতম।

অতিথি উলুবেড়িয়ার সাংসদ সাজদা আহমেদ মিশনের অনুষ্ঠানে প্রথম এসে তাঁর অনুভূতির কথা জানান। তিনি বলেন, এটা আমার জন্য গর্বের যে, এই প্রতিষ্ঠান আমার লোকসভা এলাকার মধ্যে আছে। এই প্রতিষ্ঠান মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের যেভাবে তৈরি করছে, সেটি অবশ্যই প্রশংসনীয়। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানে সুযোগ পেয়ে তোমরা যাতে সফল হতে পার তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। মিশনের সুপারভাইজার সেখ মারুফ আজম আল-আমীনের শুরুর দিকের কঠিন লড়াই এবং সুপারিন্টেনডেন্ট এম আব্দুল হাসেম মিশনের বিকাশে এম নুরুল ইসলামের অসামান্য অবদানের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর নিজ পরিচয়ের সঙ্গে খলতপুরের আল-আমীন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন উদয়নারায়ণপুরের ওসি মৌমন চক্রবর্তী। সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে সমাজসেবক ও সমাজসংস্কারক উভয়ের আশ্চর্য সংমিশ্রণ দেখেছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি আমাদের দেশের প্রধান দুই ধর্মের উজ্জ্বল গুণ এবং মানসিকতারও উল্লেখ করেন।

সকালে রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় দিনের উৎসব শুরু হয়। এ-দিনের অনুষ্ঠানে ব্যতিক্রমী আলোচনা করেন পার্ল অ্যাকাডেমির স্কুল অব মিডিয়ার ডিন অধ্যাপক উজ্জ্বল কে চৌধুরী। তাঁর মতে ডিগ্রির চেয়ে দক্ষতা, প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতা বেশি জরুরি। তিনি মুখস্থবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল শিক্ষার পরিবর্তে মূল্যবোধ ও প্রয়োগসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থাই আমাদের ভবিষ্যৎ বলে মন্তব্য করেন। তিনি আল-আমীনের এই প্রচেষ্টাকে চারিত্রিক-দক্ষ-মানুষ সৃষ্টির প্রতিষ্ঠান বলে মন্তব্য করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আল-আমীন দক্ষতাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ব শান্তি সম্মেলন আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। দু-দিনের এই অনুষ্ঠানে তিনজন মিশনবন্ধু শিক্ষক, যাঁরা তাঁদের শিক্ষকতা দিয়ে মিশনের বিকাশে সহযোগী হয়েছেন, তাঁদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। এঁরা হলেন— অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মৃণালকান্তি দোয়ারি, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দিলীপকুমার কর্মকার এবং অধ্যাপক রমজান মণ্ডল। মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিঙে অভাবনীয় ফল করে মিশনকে গর্বিত করা ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্কুল এডুকেশনের ডেপুটি ডিরেক্টর আব্দুস সালাম, কালনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জাহাঙ্গীর মল্লিক, রাজ্যের মাদ্রাসা এডুকেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সেখ আব্দুল মান্নাফ আলি, সরকারি আধিকারিক লিয়াকত আলি, অধ্যাপক জয়ন্ত আচার্য, ড. প্লাবনকুমার ভৌমিক, হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য মৃত্যুঞ্জয় সামন্ত, উদয়নারায়ণপুর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ লক্ষ্মীকান্ত দাস, আরডিএ গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান শিবনাথ মুখার্জী, আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এম এ রশিদ, আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের ট্রেজারার কাজি আবদুল বশির, আল-আমীন মিশনের ট্রেজারার আবু সালেহ রেজওয়ানুল করিম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যান ড. সেখ মহম্মদ হাসান এবং আল-আমীন মিশনের সভাপতি সেখ মহম্মদ আলি। দুই ছাত্রী লুবনা ও শবনমের কোরআন তেলাওয়াত এবং বাংলা তর্জমা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু এবং ছাত্রীদের সুমধুর সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

ডব্লিউ.বি.সি.এস. প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ১১৩ জন সফল

আল-আমীন মিশন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াও প্রশাসনিক আধিকারিকদের গুরুত্ব প্রথম থেকেই বুঝেছিল। সে-কারণেই বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই মিশনের তরফে ডব্লিউ.বি.সি.এস.-এর কোচিঙের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সদ্য প্রকাশিত ডব্লিউ.বি.সি.এস. প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলে মিশনের ১১৩ জন উত্তীর্ণ হয়ে সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। বারুইপুর ও পাঁচুড়ের আবাসিক ও পার্কসার্কাসের ক্লাস-রুম ডব্লিউ.বি.সি.এস. কোচিং সেন্টার থেকে এঁরা সকলেই কোচিং নিয়েছেন। মাস দুয়েক আগে প্রকাশিত ডব্লিউ.বি.সি.এস.-এর আটটি বিভাগের মধ্যে গ্রুপ সি-র মোট ১১ জন সফল হয়েছিলেন। গত বছর প্রকাশিত গ্রুপ এ-র ফলেও মিশনের দু-জন সাফল্য পেয়েছিলেন। মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম এই সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে মুবারকবাদ জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ১১৩ জনের মধ্যে নাসরিন খান, সাহিনা খাতুন, আতিকা খাতুন, শরিফা বেগম প্রমুখ মোট ১৩ জন তরুণীও সাফল্য পেয়েছেন। নাসিবুল মণ্ডল, মহম্মদ ইনসান আলি, মনোওয়ার আলি সরকার, মইদুল

হক, অনির্বাণ সরকার প্রমুখ সফলদের অধিকাংশই গ্রামবাংলার প্রান্তিক সমাজের তরুণ, যাঁরা নামমাত্র ফিজে মিশন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। আল-আমীন মিশন স্টাডি সার্কলের ডিরেক্টর দিলদার হোসেন এই ফলে খুশি ব্যক্ত করেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, পরবর্তী ফাইনাল পরীক্ষাতেও এইসব সফল তরুণ-তরুণীরা নিশ্চিত সফলতা পাবেন এবং কর্মজীবনে তাঁরা সৎ ও সহমর্মী অফিসার হবেন।

ইঞ্জিনিয়ারিঙেও সফল আল-আমীন

র‍্যাঙ্ক ৩৯৩
আবু হাসান গাজি

র‍্যাঙ্ক ৪০২
সাইফ রাজ

র‍্যাঙ্ক ৪০৩
মুইন নাসিফ

র‍্যাঙ্ক ৪৫৬
মাকসেদুল রহমান

র‍্যাঙ্ক ৫৫৩
মহ. রুমানুজ্জামান

র‍্যাঙ্ক ৫৯২
সালমান সেখ

র‍্যাঙ্ক ৬৪২
উমর ফারুক

র‍্যাঙ্ক ৭৬৫
হাসানুর ইসলাম

মাধ্যমিক উচ্চ-মাধ্যমিক হোক বা সর্বভারতীয় নিট, আল-আমীনের ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্যের গ্রাফ বরাবর ঊর্ধ্বমুখী। রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ইঞ্জিনিয়ারিঙের ফলেও সেই ধারা বর্তমান। এ-বছর ৫০০০-এর মধ্যে ৬২, ৭৫০০-এর মধ্যে ১২৫, ১০০০০-এর মধ্যে ১৭৬, ১২৫০০-এর মধ্যে ২১৮ এবং ১৫০০০-এর মধ্যে ২৫৩ জন র‍্যাঙ্ক করে সফলতা পেয়েছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুরের উচ্চ-মাধ্যমিক পাস আব্দুর রসিদ মোল্লা ও মাধ্যমিক পাস হাসনা বানু গাজির শ্রমজীবী পরিবারের সন্তান আবু হাসান গাজি রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ৩৯৩ র‍্যাঙ্ক করে মিশনের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সে খলিশানি শাখার ছাত্র। আবু হাসান সপ্তম শ্রেণি থেকে মিশনের খলতপুর শাখায় পড়েছে। ওই শাখা থেকে ২০১৭ সালে ৯০.৭ শতাংশ এবং এ-বছর খলিশানি শাখা থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮৯.৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছে সে। রানিং বছরে তার এই সাফল্যে স্বভাবতই মিশনে ও তার গ্রামে আজ খুশির মেজাজ। গণিতের কঠিন থেকে কঠিনতর সমস্যার সমাধান করতে তার ভালো লাগে বলে জানায় আবু হাসান। সে ক্রিকেট খেলার ভক্ত। ছোটো থেকেই মেধাবী আবু হাসানের আব্বা-মা মিশন কর্তৃপক্ষের বদান্যতায় কৃতজ্ঞ, কারণ, তাঁদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে ফিজে বেশ ভালো রকমের ছাড় দেওয়া হয়েছিল।

মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার স্নাতক মইদুল ইসলাম ও মাধ্যমিক পাস সাহিদা বেগমের সন্তান সাইফ রাজ রাজ্য জয়েন্টে ৪০২ র‍্যাঙ্ক করে (ও.বি.সি. র‍্যাঙ্ক ৬) মিশনের সূর্যপুর শাখায় প্রথম হয়েছে। সাইফ গত ২০১৭ সালে মাধ্যমিকে ৮৯ শতাংশ পেলেও এ-বছরই বিজ্ঞান বিভাগে ৯০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। চলতি বছরেই ইঞ্জিনিয়ারিঙে তার এই সাফল্যে সাইফের বাড়িতে আজ খুশির হাওয়া। ৪০৩ র‍্যাঙ্ক (ও.বি.সি. ৭) করে দ্বিতীয় হয়েছে ওই শাখারই মুইন নাসিফ। মুইনের আব্বা মনিরুল ইসলাম একজন শিক্ষক এবং উচ্চ-মাধ্যমিক পাস তার মা নিলুফা ইয়াসমিন গৃহবধূ। তাদের বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনার কৈখালি। এই শাখায় তৃতীয় হয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মগরাহাটের বেড়ামারা গ্রামের সামান্য এক সেলসম্যান হাসানুর জামান মোল্লার সন্তান মাকসেদুল রহমান মোল্লা। তার র‍্যাঙ্ক ৪৫৬। মিশনের নয়াবাজ শাখায় প্রথম হয়েছে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার খড়িবোনা গ্রামের উচ্চ-মাধ্যমিক পাস মুদি-দোকানি উজির সেখ ও গৃহবধূ রুবিয়ারা খাতুনের সন্তান মহম্মদ রুম্মানুজ্জামান। তার র‍্যাঙ্ক ৫৫৩ (ও.বি.সি. ১৩)। রুম্মানুজ্জামান মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকে যথাক্রমে ৯১.১ ও ৮৫.৮ শতাংশ নম্বর পেয়েছিল। নিম্নবিত্ত পরিবারের এই মেধাবী ছাত্রটি মিশনের আর্থিক সহায়তায় পড়াশোনা করে এই সাফল্য অর্জন করেছে। এই শাখায় দ্বিতীয় হয়েছে নদিয়ার তেহট্টের আসাফ আলি খান। তার র‍্যাঙ্ক ১৫৯৩। মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম সফল পড়ুয়াদের মুবারকবাদ জানিয়েছেন।

সূর্যপুর শাখায় বার্ষিক সমাবর্তন

আল-আমীন মিশন একাডেমি, সূর্যপুর শাখায় গত ২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক সমাবর্তন ও কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আল-আমীন মিশনের প্রাণপুরুষ এম নুরুল ইসলাম ছাড়াও বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ মেহেদি কালাম ছাত্রদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রকৃত মানুষ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, "সূর্যের মতো উজ্জ্বল হতে হলে সূর্যের মতো জ্বলতে হবে।" মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম বিশিষ্ট জনেদের ধন্যবাদ জানিয়ে অতীতের কথা রোমন্থন

করেছেন। তিনি ছাত্রজীবনে মন দিয়ে শিক্ষকদের কথা শুনতেন, তাই তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে এই নবজাগরণ আনতে পেরেছেন। তিনি ছাত্রদের মন দিয়ে কথা শোনার পরামর্শ দিয়েছেন। সময়ের মূল্য দিলে সময়ও তার প্রতিদান দেয়, সেটাও ছাত্রদের স্মরণ করিয়ে দেন। মিশনের স্টাডি সার্কলের ডিরেক্টর দিলদার হোসেন আল-আমীন মিশনের অবদানের কথা বলেছেন এবং ছাত্রদের মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়েছেন। এম এ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি আমিনুদ্দিন সিদ্দিকি ছাত্রদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পাশাপাশি প্রকৃত মানুষ হওয়ার কথা বলেছেন। মিশনের কলকাতা অফিসের আধিকারিক মহ. মহসীন আলি ছাত্রদের কেরিয়ার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অন্যান্য অতিথিরা ছাত্রদের মানুষ হয়ে সমাজের কাজে লাগার পরামর্শ দিয়েছেন। বিগত বছরের ন্যায় এ-বছরও মিশনের দেয়াল পত্রিকা ‘কারুবাকী’-র সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ‘কারুবাকী’-র উদ্‌বোধক ছিলেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম এবং যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রবিউল হক মহাশয়। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন— বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ইউনুস সরদার, এম এ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক নাসিরুদ্দিন মণ্ডল, আল-আমীন মিশনের প্রাক্তনী ও অন্যতম আধিকারিক আলমগীর বিশ্বাস, ডাক্তার কবির হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার নজরুল ইসলাম। সর্বোপরি সূর্যপুর শাখার প্রাক্তনীরা সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানকে আরও বর্ণময় করে তোলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন সূর্যপুর শাখার সুপারিনটেনডেন্ট সেখ রাজীব হাসান এবং শিক্ষকমণ্ডলী।

নিউটাউনে নতুন ভবনের ফলক উদ্‌বোধন

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নিউটাউনে ‘আল-আমীন মিশন ইনসটিটিউট ফর এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং’-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কলকাতার মহানাগরিক তথা রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, “তোমরা এগিয়ে যাও, আদর্শ মানুষ হও, তোমাদের পরিচয়ে বাবা-মায়ের মুখ যেন উজ্জ্বল হয়।” স্বাগত ভাষণে মিশনের সাধারণ সম্পাদক বলেন, পড়াশোনা করে বাবা-মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। ছেলেমেয়েদের যুগোপযোগী শিক্ষার পাশাপাশি মূল্যবোধ ও নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্রে বলীয়ান হয়ে রাজ্য তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। জীবনে সফলতার পরে জাতির প্রতি যে দায়বদ্ধতা আছে, তা যেন আমরা কেউ না ভুলে যাই, সে-বিষয়েও সজাগ থাকার পরামর্শ দেন তিনি। এ-দিনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের শীর্ষে থাকা মিশনের ৪০ জন প্রাক্তনীকে ‘অনন্য প্রাক্তনী সম্মাননা’ প্রদান করা হয়। মিশন পরিবারের প্রথম ডাক্তার খন্দকার ফরিদউদ্দিন থেকে ২০০৭ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী মহম্মদ আরিফ শেখ প্রমুখের হাতে স্মারক তুলে দেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এ ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষদস্তিদার, স্থানীয় বিধায়ক তথা বিধাননগরের মেয়র সব্যসাচী দত্ত, সাংসদ নাদিমুল হক, বিধায়ক আবু

তাহের খান, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের সচিব ডা. পি বি সেলিম, আই.এ.এস.-সহ বিশিষ্ট জনেরা। আল-আমীন মিশনের শিক্ষা প্রসারের কাজে অভিভূত হয়ে সাংসদ তহবিল থেকে ৫০ লক্ষ টাকা অনুদানের কথা অনুষ্ঠানমঞ্চে ঘোষণা করেন সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষদস্তিদার।

মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক ছাড়াও মিশন এতদিন ধরে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডব্লিউ.বি.সি.এস. পরীক্ষার কোচিং দিয়ে এসেছে। ফলস্বরূপ কয়েক হাজার সংখ্যালঘু ছেলেমেয়ে চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, অফিসার হতে পেরেছেন। এ ছাড়াও মিশনের প্রচেষ্টায় সংখ্যালঘু ছেলেমেয়েদের মধ্যে, বিশেষ করে বিজ্ঞানের গবেষণা করার সুযোগ বেড়েছে। মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম জানান, নিউ টাউনের ‘আল-আমীন মিশন ইনসটিটিউট ফর এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং’ ক্যাম্পাসে গবেষণা ছাড়াও মেডিকেলের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশনের কোচিং দেওয়া হবে। এখানে থাকবে আই.আই.টি., আই.আই.এম., ক্যাট, ম্যাট, আই.এ.এস., আই.পি.এস., ডব্লিউ.বি.সি.এস. তথা ইউ.পি.এস.সি.-র বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার আবাসিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র। সেইসঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ট্রেনিঙের ব্যবস্থা, আর থাকবে শিক্ষা ও সমাজবিজ্ঞান নিয়ে নানান বিষয়ে গবেষণার সুযোগ। আগামী সময়ে এটাই হবে আল-আমীনের প্রধান কেন্দ্র— ‘সেন্টার অফ এক্সেলেন্স’। ■

এটি নানান টুকরো টুকরো বিভাগের সমন্বয়। বই, মহাকাশ— কী নেই! রত্নে ভরা আলিবাবার গুহা যেন।

তারায় তারায়

পুনর্বসু

ফেব্রুয়ারি-মার্চের সন্ধ্যার আকাশে মাথার ওপর দেখা যায় আর্দ্রা নক্ষত্রকে। পুনর্বসু নক্ষত্রের অবস্থান আর্দ্রার পূর্বে। পুনর্বসু শব্দটির বসু অংশটির অর্থ দীপ্তি এবং পুনর্ শব্দের অর্থ দ্বিতীয় বার। সুতরাং পুনর্বসুর অর্থ দুটি দীপ্তি বা জ্যোতি। আসলে পুনর্বসু দুটি তারার সমষ্টি। ইউরোপ ও উত্তর-দক্ষিণ দুই আমেরিকা মহাদেশে প্রাচীন সময় থেকে মিথুন রাশির এই তারাদুটিকে কল্পনা করা হয়েছে যমজ ভাই হিসেবে। তাঁরা কল্পনা করতেন, যেন দুই ভাই হাত ধরাধরি করে আকাশে নাচছে। গ্রিক পুরাণের বিখ্যাত দুই ভাই ক্যাস্টর ও পোলাক্সের নাম অনুযায়ী তারাদুটির নামকরণ করা হয়েছে। গ্রিক পুরাণকথা অনুযায়ী একটি লড়াইয়ে ক্যাস্টর মারা গেলে, দেবরাজ জিউসের আশীর্বাদপ্রাপ্ত পোলাক্স তাঁর অমরত্বের অর্ধেক ক্যাস্টরকে দিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে তোলেন। তাঁদের পরস্পরের প্রতি এই ভালোবাসার জন্য দেবতারা তাঁদের মিথুন রাশির মধ্যে যমজ দুটি তারা বানিয়ে দেন।

ক্যাস্টর তারাটি বৈজ্ঞানিকরা চেনেন আলফা জেমিনোরাম নামে। খালি-চোখে একে একটি তারা মনে হলেও এটি আসলে ছয়টি তারার সমষ্টি। ছয়টি তারা তিনটি বাইনারি সিস্টেমে সজ্জিত। বাইনারি সিস্টেম বলতে বোঝায়— দুটি তারা পরস্পরকে ভরকেন্দ্রে রেখে একে অপরের চারপাশে চর্কিপাক খাচ্ছে। ক্যাস্টর তারাটি পৃথিবী থেকে প্রায় ৫১ আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত। এটি A-type মেইন সিকোয়েন্স তারা। অর্থাৎ উজ্জ্বলতায় ও আকারে সূর্যের থেকে বড়ো। কিন্তু ভর সূর্যের থেকে কম, প্রায় অর্ধেক। পোলাক্স তারাটি একটি কমলা বর্ণের দানব তারা। এটি সূর্য থেকে ৩৪ আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত। এবং মিথুন বা জেমিনি নক্ষত্রমণ্ডলীর সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা। বিজ্ঞানীরা একে চেনেন বিটা-জেমিরোনাম নামে। পোলাক্সের আপাত ঔজ্জ্বল্যের মান ১.১৪। ক্যাস্টরকে পোলাক্সের পাশে অনেকটাই নিষ্প্রভ লাগে আকাশে। পোলাক্স সূর্যের থেকে আকারে অনেক বড়ো। ভর সূর্যের দ্বিগুণ এবং ব্যাসার্ধ সূর্যের নয় গুণ। একসময় ক্যাস্টরের মতো পোলাক্সও A-type মেইন সিকোয়েন্স তারা ছিল, কিন্তু এখন ভেতরের হাইড্রোজেন জ্বালানি ফুরিয়ে ফেলে দানব তারায় পরিণত হয়েছে। উজ্জ্বলতায় পোলাক্স তারাটির স্থান তারাদের মধ্যে সতেরো। পোলাক্স তারাটির বাইরের অংশের তাপমাত্রা ৪৬৬৬ কেলভিন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোককথায় এই দুটি তারাকে যমজ ভাই বলে কল্পনা করা হয়েছে। প্রাচীন আরবের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ক্যাস্টরের নাম দিয়েছিলেন আল-রাস আল-তাউস আল-মুকাদিম। যার অর্থ যমজ ভাইদের মাথা। আল-আসোসি আল-মোয়াত্তকেত নামক একটি আরবি ভাষায় লেখা তারা সম্পর্কিত বিবরণীতে একে বলা হয়েছে আওল-আল-দিজিবা, যার ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদে নাম হয়েছে— প্রাইমা ব্রাচি। এর অর্থ সামনের পায়ের থাবা। চীনা ভাষায় এর নাম বেই-হে নামক তারামণ্ডলী। তিনটি তারার সমষ্টি হিসেবে একে কল্পনা করা হয়েছে। যার প্রধান দুটি তারা হল ক্যাস্টর ও পোলাক্স। বেই-হেইয়ের অর্থ হল উত্তরের নদী। ক্যাস্টরকে বলা হয় বেই-হে-এর অর্থাৎ উত্তরের নদীর দ্বিতীয় তারা। এবং পোলাক্সকে বলা হয় বেই-হে-সান বা উত্তরের নদীর তৃতীয় তারা। আল-আসোসি আল-মোয়াত্তকেত-এর বিবরণীতে পোলাক্সের নাম পাওয়া যায় মুয়েখের-আল-দিজিবা নামে। যার ল্যাটিন নাম পস্টেরিয়র ব্রাচি। এর অর্থ পিছনের পায়ের থাবা। সংস্কৃতে এই যমজ তারাদুটিকে একসাথে পুনর্বসু বলা হয়েছে, কিন্তু প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে লেখাগুলি পড়লেই বোঝা যাবে, তখনকার মানুষজন, পুনর্বসু আসলে দুটি তারার অংশ, তা জানতেন। তৈত্তিরীয় সংহিতা, শাকল্যসংহিতা এবং খণ্ডখাদ্যকে পুনর্বসু নক্ষত্রকে দুটি তারা বলা হয়েছে।

পুনর্বসুর দেবতা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে অদিতিকে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে

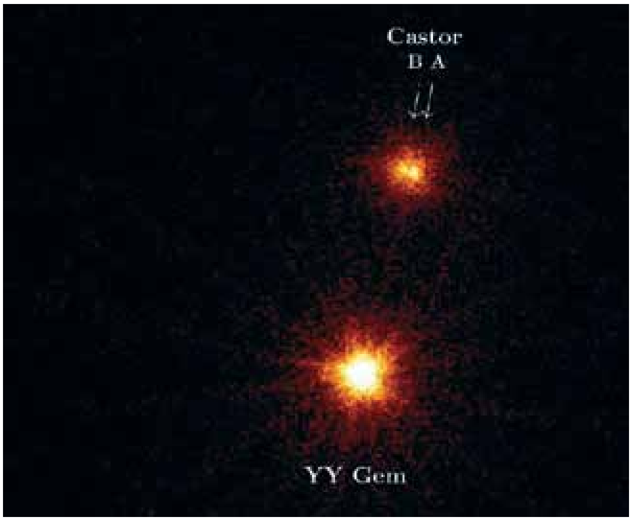

পাওয়া যায়, একসময় সমস্ত দেবতারা যজ্ঞ থেকে সরে গিয়েছিলেন। তখন তাঁরা অদিতিকে বললেন যজ্ঞের সন্ধান দিতে। অদিতি বললেন, "আমায় বর দেওয়া হোক— আমার মধ্যেই যজ্ঞের শুরু আর আমার মধ্যেই যজ্ঞের শেষ।" যজ্ঞের শুরু ও শেষ এই দুটি যমজ তারা হয়ে আকাশে আজও জ্বলজ্বল করছে।

অতনুমিথুন মণ্ডল

দেশ

কাজাখস্তান

মধ্য এশিয়ার মধ্যমণি কাজাখস্তান দেশটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি দেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য, খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য, লৌকিক সংস্কৃতির অতুলনীয় সম্ভারে সজ্জিত এই দেশটি পৃথিবীর বৃহত্তম ল্যান্ডলক্‌ড দেশ। অর্থাৎ এমন একটি দেশ, যার সীমানায় কোনো জলভূমি নেই। চারিদিক স্থলভূমি দিয়ে ঘেরা। আয়তনে কাজাখস্তান পৃথিবীর নবম বৃহত্তম দেশ। আয়তন ২ লক্ষ ৭২ হাজার ৯০০ বর্গকিলোমিটার। কাজাখস্তানের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে রাশিয়া, পূর্বে চীন, দক্ষিণে কিরঘিজস্তান ও উজবেকিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তান, পূর্ব-পশ্চিমে দেশটির বিস্তার প্রায় ২৯৩০ কিলোমিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে এর বিস্তার ১৫৩৬ কিলোমিটার। এশিয়া ও ইউরোপ দুই মহাদেশেই ছড়িয়ে রয়েছে এ-দেশের অংশ।

সময়ের ধূসর আস্তরণ সরিয়ে সরিয়ে কাজাখভূমির ইতিহাস ঘাঁটলে পাওয়া যাবে এই কাজাখস্তান ছিল বিভিন্ন যাযাবর জাতি ও সাম্রাজ্যের চারণভূমি। যাযাবর স্কিথিয়ান জনজাতি ও পারস্যের বিখ্যাত আকামেনেদীয় বংশের শাসনভূমি ছিল এই দেশের দক্ষিণ অংশ। তুর্কি-গোত্রীয় দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতিগুলি এই দেশে কয়েক শতাব্দী ধরে দাপিয়ে বেড়িয়েছে। ত্রয়োদশ শতকে দুর্ধর্ষ মোঙ্গালসম্রাট চেঙ্গিজ খানের শাসনের আওতায় আসে কাজাখস্তান। ষোড়শ শতাব্দী থেকে কাজাখরা একটি জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যদিও তারা তিনটি প্রধান শাখায় বিভক্ত ছিল। এই শাখাগুলির মধ্যে মাঝে-মাঝেই যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। অষ্টাদশ শতকে রাশিয়ানরা কাজাখস্তানের দখল নেয়। তারপর প্রায় ২৫০ বছরেরও বেশি সময় চলে রাশিয়ানদের শাসন। পরবর্তী সময়ে বিখ্যাত রাশিয়ান সাম্রাজ্যের ভিত্তি গড়ে তোলাতে ছিল অসংখ্য কাজাখ যোদ্ধার আত্মবলিদান। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় কখনো তাদের নাম আসেনি। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর কাজাখস্তান তার স্বাধীন অস্তিত্ব ফিরে পেয়েছিল সাময়িকভাবে। কিন্তু ১৯৩৬ সালে দেশটিকে আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে কাজাখ সোভিয়েত রিপাবলিক নামে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়।

'কাজাখ' শব্দটি এসেছে প্রাচীন তুর্কি শব্দ 'কাজ' (Qaz) থেকে। 'কাজ' শব্দের অর্থ—ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো, যা কাজাখভূমির বসবাসকারী জাতিগুলির ভবঘুরে, যাযাবরি স্বভাবকে বোঝাত। রাশিয়ান 'কসাক' শব্দের উৎস এই 'কাজ' শব্দ থেকে। ম্যাক্সিম গোর্কি, ইভান তুর্গেনিভ, মিখাইল শলোকভ প্রমুখ দিকপাল রাশিয়ান সাহিত্যিকদের লেখায় যে-কসাকদের নানা বীরগাথা, সাহস, নিষ্ঠুরতার হাড়হিম কাহিনি পাওয়া যায়, তা এই কাজাখভূমির যাযাবর জাতিগুলিরই নানা ইতিবৃত্ত। কাজাখ শব্দের সঙ্গে ফারসি শব্দ স্তান যোগ করে দেশটির নাম হয়েছে কাজাখস্তান, অর্থাৎ কাজাখদের বাসভূমি। যদিও এখন কাজাখ বলতে যেমন শুধুমাত্র কাজাখস্তানে বসবাসকারী মানুষদেরই বোঝায়, সে-সময় তা ছিল না। চীন, রাশিয়া, তুরস্ক, উজবেকিস্তানের একটা বৃহত্তর অঞ্চলের যাযাবর মানুষকে কাজাখ বলা হত।

প্রাচীন-প্রস্তর যুগের সময় থেকে এখানে মানুষের বসবাসের হদিশ পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে নব্য-প্রস্তর যুগে এখানকার জলবায়ু স্থায়ী জীবনযাপনের অনুকূল ছিল না। তাই যাযাবর মানুষদের বাসভূমি হিসেবে গড়ে ওঠে। ইউরেশিয়ান অঞ্চলের যে বিস্তীর্ণ ঘাসের বন, তা স্তেপ নামে পরিচিত। এই স্তেপভূমি ছড়িয়ে ছিল পূর্ব ইউরোপ, মধ্য-এশিয়া, চীন, দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্য-প্রাচ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। রেশম বাণিজ্যপথ তৈরির আগে এই স্তেপভূমির মধ্য দিয়েই বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ হত। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন, এই অঞ্চলের মানুষরাই প্রথম ঘোড়াকে পোষ মানায়।

কিউমান বা তুর্কি যাযাবর মানুষরা কাজাখস্তানের স্তেপভূমিতে পা রাখে একাদশ শতাব্দীতে। এখানে তারা আরেকটি যাযাবর জাতি কিপচাকদের সঙ্গে মিশে যায় ও শাসন করতে থাকে। ত্রয়োদশ শতকে এরা সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে মোঙ্গাল রাজত্বের সময়। এবং এই সময় থেকে যাযাবর জাতিগোষ্ঠীগুলি মিলিত হয়ে শক্তিশালী একটি সংঘে পরিণত হয়, যা ইতিহাসে 'কাজাখ-খানাত' নামে পরিচিত। এই সময়ে যাযাবর জীবন ও পশুপালননির্ভর অর্থনীতি স্তেপভূমি অঞ্চলগুলিতে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। পঞ্চদশ শতক থেকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যেকার বিভেদ ভুলে কাজাখ বলে পরিচয় দিতে থাকে। এ-সময়ই কাজাখ ভাষা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠতে থাকে। এই এলাকায় ক্রমে কাজাখ আমিরদের সঙ্গে দক্ষিণের ফারসি ভাষাভাষী মানুষদের দ্বন্দ্ব গড়ে ওঠে।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের ইতিহাস কাজাখদের মধ্যেকার তিনটি শাখার পারস্পরিক লড়াইয়ের। এই সময় উজবেকিস্থানের একটি শাসকগোষ্ঠী খিবা-খানাত কাজাখস্তান দখল করে। উজবেকদের শাসনের কিছুকাল পর কাজাখস্তানের দখল নেয় রাশিয়ানরা। রাশিয়ান সাম্রাজ্যের সম্রাটকে বলা হত জার। জারের শাসনে গোটা কাজাখস্তান জুড়ে গড়ে তোলা হয় অসংখ্য সেনাছাউনি। এই সময়কাল পৃথিবীর দুই বড়ো সাম্রাজ্যের লড়াইয়ের সময়। ইতিহাসে যা 'Great game' নামে পরিচিত। মধ্য-এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য বৃটিশ ও রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। সমস্ত শাসিত এলাকায়, স্কুলে ও প্রশাসনিক দপ্তরে এ-সময় রুশ ভাষা চালু হয় সবার মধ্যে একাত্মবোধ জাগানোর উদ্দেশ্যে।

রাশিয়ান সাম্রাজ্যের এই সিদ্ধান্ত কাজাখস্তানের সাধারণ মানুষদের মনে মারাত্মক অসন্তোষের সৃষ্টি করে এবং ১৮৬০ সাল নাগাদ তারা জারের শাসনের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করে। রাশিয়ানদের চাপিয়ে দেওয়া সংস্কৃতি তাদের যাযাবরি জীবন ও পশুপালননির্ভর জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। খরা, দুর্ভিক্ষ, অনাহার, মড়কে অনেক কাজাখ উপজাতি সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে যায়।

উনিশ শতকের শেষের দিকে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি, পরিচিত রাশিয়ানদের হাত থেকে রক্ষার জন্য কাজাকরা স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে জারের শাসনের পতন ঘটলে কাজাখস্তান সাময়িকভাবে স্বাধীনতা ভোগ করে। কিন্তু ১৯২০ সালের ২৬ অক্টোবর কিরঘিজ অটোনোমাস সোসালিস্ট সোভিয়েত রিপাবলিক নামে তা সোভিয়েতের অংশ হয়ে যায়। জারের অত্যাচারী শাসনের দুঃখভরা দিনগুলো কিন্তু বলশেভিক বিপ্লবের পরবর্তী সময়েও ঘুচল না। মানুষে মানুষে অসাম্য দূর করতে নীতি নেওয়া হল— সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ হবে। কোনো মানুষের ব্যক্তিগত জমি থাকবে না। সব জমির দায়িত্ব নেবে দেশ। মানুষ শুধু সেখানে কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হবে। ফসল ফলাবে, নিজের খাবারের ভাগ নেবে। ধনী-দরিদ্র বৈষম্য দূর হবে। কিন্তু এই নীতির ফলে কাজাখ জমিদার শ্রেণির ওপর অত্যাচার শুরু হল। তাদের বিপুল পরিমাণ জমিজমা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে দুর্ভিক্ষ যেন লেগেই ছিল। তা ছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অস্ত্র নির্মাণের প্রয়োজনে কাজাখস্তানের খনি থেকে প্রচুর পরিমাণে ধাতব আকরিক তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, কাজাখস্তানে খনিজ সম্পদ বিপুল। এখনও ইউরেনিয়াম, সোডিয়াম, সিসা, জিঙ্ক প্রভৃতি ধাতুর পরিমাণের হিসেবে কাজাখস্তান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়। অন্যান্য ধাতুর পরিমাণও এখানকার খনিতে যথেষ্ট। এই কারণে এই দেশটিকে এক সময় ভারী-শিল্প স্থাপনের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের জন্য কাজাখস্তানের বিশেষ ভূমিকে ব্যবহার করে এবং ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৫৬-টি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। যা ওখানকার অর্থনীতি ও বাস্তুতন্ত্রের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব তৈরি করে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের স্বাস্থ্যের গভীর ক্ষতি সাধিত হয়, যার ফলশ্রুতিতে মারণ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ১৯৮০ সাল থেকে কাজাখস্তানে তীব্র পরমাণু-বিরোধিতা শুরু হয়। ১৯৯০ সালের ২৫ অক্টোবর কাজাখস্তানের মানুষরা হঠাৎ করে নিজেরাই নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁরা ঘোষণা করেন, তাঁরা আর সোভিয়েতের অংশ নন। ১৯৯১ সালে সুবিশাল সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর কাজাখস্তান স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রায় ২৫০ বছরের রাশিয়ার অধীনতার পর, সোভিয়েত যুগের নেতা নুরসুলতান নাজারবায়েভ দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন।

কাজাখস্তান দেশটিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে ভূস্বর্গ বললেও কম বলা হয়। সমভূমি, স্তেপভূমি, তৈগা অরণ্যভূমি, গিরিখাত, পাহাড়, ব-দ্বীপ, তুষার-ঢাকা পর্বতশৃঙ্গ, মরুভূমি— এত বিভিন্নরকম ভূমিরূপ এখানে দেখা যায়। ইউরোপ ও এশিয়াকে ভাগ করেছে যে উরাল নদী, তা কাজাখস্তানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এই বিপুল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এখানে ভিড় করে। দেশটির আয়ের একটা বড়ো উৎস বিদেশি পর্যটকদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য যে জায়গাগুলোয় মানুষ বেশি যায়, বলখাস হ্রদ তাদের মধ্যে অন্যতম। বিখ্যাত সিরদরিয়া নদী এই দেশের মধ্যে দিয়েই প্রবাহিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয় হলেও কাজাখস্তানের জলবায়ু মোটেও সুখকর নয়। গ্রীষ্মকালে যেমন কষ্টকর গরম, শীতকালে তেমন হাড়কাঁপানো ঠান্ডা। নুরসুলতান বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম অঞ্চল। এই কারণে কাজাখস্তানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে মাত্র ৮ জন লোক বাস করেন।

দানাশস্য, আলু, আঙুর, তরমুজ চাষ হয়। পশুপালনও বহু মানুষের পারিবারিক পেশা। কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ প্রায় ৮ লক্ষ ৪৬ হাজার বর্গকিলোমিটার। কাজাখস্তানের আপেলের পৃথিবীজোড়া নাম। আলমাটি অঞ্চলে আপেলের চাষ ভালো হয়। 'আলমাটি' শব্দের অর্থ সুন্দর আপেল।

২০১৭ সালে কাজাখস্তানের জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৫৪ লক্ষ ৬০ হাজার ৪৮৪ জন। কাজাখস্তানে প্রায় ১৩৬-রকম জাতিগোষ্ঠীর বসবাস। সবচেয়ে বেশি বাস করেন কাজাখরা (৬৩.১%), রাশিয়ান (২৩.৭%), তাতার (১.৩%), ইউক্রেনিয়ান (২.১%), উজবেক (২.৮%) ছাড়াও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বাস করেন। দেশের ৭৬ শতাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী, ২৪ শতাংশ খ্রিস্টান। শিক্ষার হার অত্যন্ত ভালো, প্রায় ৯৯.৫ শতাংশ মানুষ সাক্ষর।

কাজাখ সংস্কৃতির একটি গৌরবজনক ধারা হল মৌখিক সাহিত্য। মধ্য-এশিয়ার যাযাবর জাতিগুলির মধ্যে মুখে মুখে যুদ্ধের বীরগাথা, বর্ণনা প্রচলিত ছিল। এগুলি পরম্পরাক্রমে একটা মৌখিক সাহিত্যের ধারা গড়ে তোলে। চীনা সূত্রানুযায়ী ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে তুর্কি উপজাতিগুলো কাজাখস্তানে মৌখিক কবিতার প্রথা গড়ে তোলে। এগুলি প্রাচীন সময় থেকে চারণকবি, পেশাদার গল্পবলিয়েদের মাধ্যমে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

খেলাধুলার জগতে এ-দেশের বেশ সুনাম। হকি, বাস্কেটবল, ফুটবল জনপ্রিয় খেলা। ২০০০ সালের সিডনি অলিম্পিকে এ-দেশের দুই বক্সার বেকজাত সাত্তারখানভ ও ইয়ারমাখান ইব্রাইমভ দেশের জন্য স্বর্ণপদক এনেছিলেন।

কাজাখস্তানে তিনটি ইউনেস্কো হেরিটেজ সাইট রয়েছে। খোজা আহমেদ ইয়াসুলের স্মৃতিস্তম্ভ, তামগালির প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ এবং কোরগাঝিন অভয়ারণ্য।

অতনুমিথুন মণ্ডল

বইভব

মুসলমান ভক্তচরিত
কেদারনাথ মিত্র। ভাষাবিন্যাস। কলকাতা ৯

আলোকিত জীবন ও তার আলো

সাধারণভাবে বই পড়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের জানার পরিধি বাড়াই। আমাদের অভিজ্ঞতা বই পড়লে বেড়ে যায়। বইয়ের ভেতর দিয়ে জ্ঞান সঞ্চিত হয় আমাদের হৃদয়ে। এই কথা ক-টি বললাম মূলত পেশামুখী গ্রন্থপাঠের বাইরের পড়াশোনা সম্পর্কে। কিন্তু এখন কথা হল, সবসময় একটা কথা শোনা যায়, সাধু মানুষদের জীবনকাহিনি পড়লে তাঁদের জীবনের আলো এসে পাঠকের অন্তরে প্রবেশ করে, যা আখেরে আলোকিত করে তোলে পাঠকটির জীবনকেই। যে-কারণে একসময় মহাপুরুষের জীবনকথা বিশেষভাবে পড়ার রীতি ছিল। যেন জীবনে উন্নীত হওয়ার এ এক প্রকৃত রাস্তা। সামাজিক মানুষ নানান ক্ষুদ্রতার মধ্যে আটকে থেকে জগতের বিশাল ব্যাপ্তিকে অনুভব করতেই পারেন না। মহাজনদের জীবন সেই ব্যাপ্ত প্রসারিত দিগন্তকে ছুঁয়ে আরও বিস্তৃতি লাভ করে। সামাজিক মানুষ বহু ক্ষেত্রেই ওই জীবনকথার সান্নিধ্যে এসে নিজেদের নীচতা দীনতা সীমাবদ্ধতা কাটানোর প্রেরণা পেয়ে যান, হয়তো কখনো জীবনটাই মহৎ অর্থে পালটে যায়।

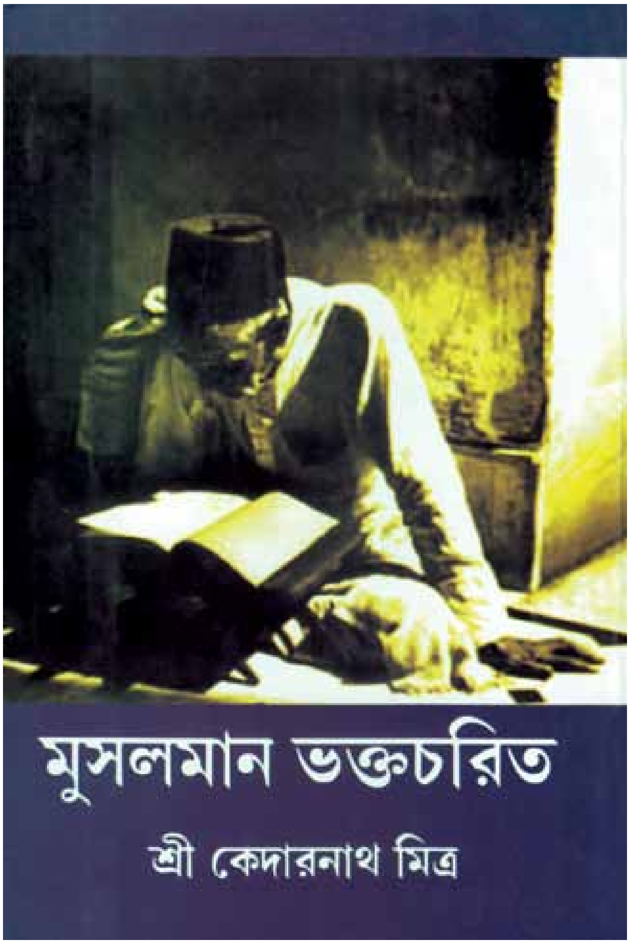

এমন একটি বই নিয়ে আজ এখানে আমরা কথা বলব, যা সত্যিই অনুপ্রাণিত করতে পারে গভীর চলার পথে গোপনে হাঁটার জন্য। বইটি এগারো জন এমন মানুষের জীবন নিয়ে রচিত, যাঁরা আজকের আত্মকেন্দ্রিকতার দিনে সত্যিই আদর্শস্বরূপ। আমরা ধর্ম মানি, কিন্তু তার নিবিড় ভূমিকা মনে-প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই না বা বলা ভালো, চাই না বলে পারি না। আমরা স্রষ্টাকে স্বীকার করি, কিন্তু তাঁর সর্বব্যাপক মহিমা গ্রহণ করে জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার কথা ভাবি না। এই বইয়ে যাঁদের নিয়ে, যাঁদের জীবনের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা তা পেরেছেন। আর পেরেছেন বলেই স্মরণীয় আজও। কত কত শত বছর আগে আরবভূমিতে জন্ম নেওয়া ওইসব মনীষী, আজ যেকোনো দেশে— আজ নয়, সব কালেই— সকল দেশের মানুষের কাছে মহাশিক্ষক। বইটির নাম 'মুসলমান ভক্তচরিত'। লেখক কেদারনাথ মিত্র। গ্রন্থনাম দেখে বোঝাই যাচ্ছে ইসলাম ধর্মাবলম্বী সাধু মহাপুরুষদের জীবনের কাহিনি এখানে বর্ণিত। মোট এগারো জন সাধুজনের যে-জীবনালেখ্য এই বইয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাঁদের জীবনীর সংস্পর্শ পাঠকচিত্তে বিশুদ্ধ অবগাহনের শান্তি এনে দিতে সক্ষম। এমনই পবিত্র এমনই নির্মলতায় পরিপূর্ণ সেসব জীবন। সবার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা আলোচনার অল্প পরিসরে সম্ভব নয়, আপাতত কয়েক জনের কিছু বিষয় উত্থাপন করছি। বাকিটা বইটি পড়ে জেনে নিতে পারলে পাঠকমাত্রেই কৃতার্থ বোধ করবেন।

আবিস করণী এক মহান সাধক। তিনি নির্জন গাছপালায় ঘেরা এক জায়গায় ছোটো একটি কুটির বানিয়ে থাকতেন। আর উট চরিয়ে, খোর্মা ফলের বীজ কুড়িয়ে বাজারে বিক্রি করে সামান্য উপার্জন করতেন। বাকি সময় ধর্ম-উপাসনা করতেন। একবার এক ধনী ধার্মিক তাঁর কাছে এসে তাঁকে কিছু অর্থ সাহায্য করতে চাইলে তিনি সোজা বলে দেন, উট চরিয়ে যে-দুটো পয়সা তিনি পেয়েছেন, যতক্ষণ তার সামান্য কিছু অংশও অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ অন্যকিছুরই তাঁর আবশ্যক নেই। কেউ উপাসনার সময় এসে বেশিক্ষণ কথা বললে বলতেন, "... এখন বড় ব্যস্ত আছি। জীবন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, কিন্তু আমার পাথেয় এখনও সংগ্রহ হয়নি।" আর বালকেরা তাঁকে পাগল ভেবে ঢিল ছুড়লে বালকদের লক্ষ্য করে বলতেন, "বালকগণ, ছোট ছোট ঢিল মারো। বড় পাথর মারলে রক্তপাত হবে, ওজু অশুদ্ধ হবে, আমি নমাজ পড়তে পারব না।" এই অভিলাষহীন এই করুণাসিক্ত জীবন আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে যায়। যেমন ধরুন সাধক ফজিল আয়জের কথা, তিনি যখন গভীর সাধনায় মগ্ন, এমন সময় তাঁর ঘরের দরজায় এসে কড়া নাড়ছেন স্বয়ং সম্রাট হারুন-অল-রসিদ। তিনি জানতে চাইলেন— কে কড়া নাড়ে? উত্তরে সম্রাট নিজের নাম জানালে সাফ জবাব দিলেন, "আমার কাছে সম্রাটের কোনো প্রয়োজন নেই, সম্রাটের কাছেও আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি এখন অন্য কার্যে ব্যস্ত আছি, আমার মন এখন চঞ্চল কোরো না।" কিন্তু সম্রাটের কাতর অনুরোধে শেষে দরজা যখন খুললেন, তার আগেই ঘরের দীপের বাতিটি নিভিয়ে দিয়েছেন, পাছে বিষয়ীর মুখ দেখতে হয়। আসলে এঁদের কাছে জগতের সর্বময় স্রষ্টাই একমাত্র বিষয়। অন্য বিষয়ে কোনো আসক্তি নেই। যেমন তপস্বিনী রাবেয়া। তিনি বলেছিলেন, যাঁরা স্রষ্টার শরণ নেন নরকের ভয়ে কিংবা স্বর্গের আশায়, তাঁদের সব প্রার্থনাই ব্যর্থ। রাবেয়ার পবিত্র জীবনের জন্য, তাঁকে এক ব্যক্তি একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এমন উন্নত অবস্থা তুমি কেমন করে লাভ করলে?" তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "আমার সর্বস্ব হারিয়ে।" পরিপূর্ণ আর শুদ্ধ একটা জীবন পাওয়ার জন্য সর্বস্ব ত্যাগের অবদান কতদূর, তা সাধিকা রাবেয়ার দিকে তাকালেই স্পস্ট হবে। এমন সব জীবনকথায় পল্লবিত এই বই নিশ্চয় জীবনের গভীর গভীরতর কোনো পরমার্থের ঠিকানার সন্ধান দিতে পারে, যদি সে-প্রত্যাশা নিয়ে এতে ডুব দেওয়া যায়। বইয়ের ভাষা দেখলেই বোঝা যায়, এই বই নির্বিশেষ সাধারণ পাঠকের কথা ভেবে লেখা। ফলে নির্বিশেষে যে-কেউ বইটি আজই পড়তে শুরু করতে পারি। পরমার্থ লাভ হলেও হতে পারে।

গালিব মহম্মদ

সবজান্তা

জানুয়ারি কথা

৪ জানুয়ারি ১৯৬১ সালে অস্ট্রিয়ার খ্যাতনামা তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী আরউইন

শ্রোয়েডিংগারের মৃত্যু। জন্ম ১২ অগাস্ট ১৮৮৭। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় একজন চরিত্র। তিনি পদার্থের তরঙ্গ-তত্ত্বের জনক, এ ছাড়াও কোয়ান্টাম মেকানিক্স সম্বন্ধে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণা রয়েছে। 'শ্রোয়েডিংগার সমীকরণ' প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ১৯৩৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স পদার্থবিদ্যার সেই শাখা, যার গুরু ডাচ বিজ্ঞানী নিলস বোর বলেছিলেন, কোয়ান্টামের প্রতিপাদ্য শুনে যিনি বিস্মিত হবেন না, তিনি এই শাস্ত্রের কিছুই বুঝবেন না। কোয়ান্টামের দুই মূল দাবির একটি— আকাশপানে না দেখলে চন্দ্র ওই স্থানে নেই, এবং দুই, কলকাতার পরীক্ষাগারে এক্সপেরিমেন্ট প্রভাবিত করতে পারে লন্ডনে এক্সপেরিমেন্টের ফলাফলকে।

আরউইন শ্রোয়েডিংগার নিজের আবিষ্কারে নিজেই বিস্মিত হয়েছিলেন এবং কাল্পনিক এক পরীক্ষার কথাও বলেছিলেন। ধরা যাক ডালাবন্ধ বাক্সে এক বিড়ালকে এক ঘণ্টা বন্ধ রাখার পর বাক্সটির ডালা খোলা হল। আমরা কী দেখব? অভিজ্ঞতা বলে, হয় জীবিত অথবা মৃত বিড়াল। কিন্তু কোয়ান্টাম যে বলে অন্য কথা। ওই শাস্ত্র অনুযায়ী, ওই এক ঘণ্টাকাল বিষক্রিয়া ঘটেছে এবং ঘটেনি। ফলে বিড়ালটি মরেছে এবং মরেনি। অর্থাৎ, ডালাবন্ধ বাক্সে একটির বদলে ছিল দুটি বিড়াল। ডালা খুলে দেখামাত্র একটিতে পরিণত হল। এটা যতখানি অসম্ভব, শ্রোয়েডিংগারের মতে কোয়ান্টামও ততখানি অবিশ্বাস্য।

কিন্তু কোয়ান্টামের পূর্বোক্ত দুই অবিশ্বাস্য দাবি দুটি পরীক্ষায় সত্য প্রমাণিত হয় ২০১৫ সালে। সে-বছর জানা যায়, স্বল্প বৃহৎ বস্তু কোটি কোটি সংখ্যক কণাপুঞ্জ শ্রোয়েডিংগার কথিত বিড়ালের মতো একাধিক দশায় একই সঙ্গে অবস্থান করতে পারে। কোয়ান্টামের দ্বিতীয় দাবি— কলকাতায় পরীক্ষা এবং লন্ডনে প্রভাব, কত দূর পর্যন্ত সম্ভব, তা নির্ণয় করতে গিয়ে গবেষকরা দেখলেন, ১৩০০ মিটার দূরেও ওই রূপ আশ্চর্য ক্রিয়া বিদ্যমান।

ফেব্রুয়ারি কথা

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬ সালে রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্ম। পূর্বাশ্রমের নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়। উনবিংশ শতকের এক প্রখ্যাত ভারতীয় বাঙালি যোগসাধক, দার্শনিক ও ধর্মগুরু। তাঁর প্রচারিত ধর্মীয় চিন্তাধারায় রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁরা উভয়েই বঙ্গীয় নবজাগরণের অন্যতম পুরোধাব্যক্তিত্ব। তাঁর ভক্তসমাজে তিনি ঈশ্বরের অবতাররূপে পূজিত হন। রামকৃষ্ণ পরমহংস গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গের এক দরিদ্র বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে পৌরোহিত্য গ্রহণের পর বঙ্গীয় তথা ভারতীয় শক্তিবাদের প্রভাবে তিনি কালীর আরাধনা শুরু করেন। পরবর্তীকালে অদ্বৈত বেদান্ত মতে সাধনা করে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন রামকৃষ্ণ। অন্যান্য ধর্মীয় মতে, বিশেষত ইসলাম ও খ্রিস্টীয় মতে সাধনা তাঁকে 'যত মত, তত পথ' উপলব্ধির জগতে উন্নীত করে।

পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক গ্রামীণ উপভাষায় ছোটো ছোটো গল্পের মাধ্যমে প্রদত্ত তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা জনমানসে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গিতে অশিক্ষিত হলেও রামকৃষ্ণ বাঙালি বিদ্বজ্জন সমাজ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সম্ভ্রম অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। সেইসঙ্গে সংগঠিত করেন একদল অনুগামী, যাঁরা রামকৃষ্ণের প্রয়াণের (১৬ অগাস্ট ১৮৮৬) পর সন্ন্যাস গ্রহণ করে তাঁর কাজ চালিয়ে যান। এঁদেরই নেতা স্বামী বিবেকানন্দ।

মার্চ কথা

১ মার্চ ১৯৮৩ সালে জন্ম একজন ভারতীয় বক্সারের। পুরো নাম মাংতে চুংনেইজাং মেরি কম। সংক্ষেপে আমরা তাঁকে চিনি মেরি কম নামে। পাঁচ বারের বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়ন এবং ছ-টি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেই পদকজয়ী একমাত্র মহিলা বক্সার। ২০১৮ সালের ২৪ নভেম্বর, নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ১০-তম এআইবিএ মহিলা ওয়ার্ল্ড বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে তিনি ৬-টি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ সোনাজয়ী বিশ্বের প্রথম মহিলার শিরোপা অর্জন করেন। তিনিই

একমাত্র ভারতীয় মহিলা বক্সার, যিনি ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকসে ৫১ কেজি ফ্লাইওয়েট বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পান। এই অলিম্পকসে তিনি পান ব্রোঞ্জ পদক। মেরি কম এআইবিএ ওয়ার্ল্ড উইমেনস র‍্যাঙ্কিং ফ্লাইওয়েট বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুরে চুরচাঁদপুর জেলার মৈরাং লামখাই, কঙ্গাথী গ্রামে দরিদ্র পরিবারে জন্ম। বাবা-মা মাংতে টনপা কম এবং মাংতে আকম কম। পরিবারটির জীবিকা ছিল ভাগচাষি হিসেবে ঝুম চাষ। জন্মের সময় মেরি কমের নাম বাবা-মা রাখেন চুংনেইজাং। অতি দীনদরিদ্র পরিবার। বাবা-মাকে চাষের কাজে সাহায্য করতেন, স্কুলে যেতেন এবং প্রাথমিকভাবে অ্যাথলেটিক্স শিখেছেন। পরে এসেছেন বক্সিঙে। মেরি কমের সৌভাগ্য যে, শত দারিদ্র্যের মধ্যেও বাড়িতে খেলাধুলোর চর্চা ছিল। মেরি কমের বাবা তরুণবয়সে ছিলেন একজন উৎসাহী কুস্তিগির।

এপ্রিল কথা

অ্যাডলফ হিটলার। জন্ম ২০ এপ্রিল ১৮৮৯। অস্ট্রীয় বংশোদ্ভুত জার্মান রাজনীতিবিদ, যিনি ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টির নেতৃত্ব

দিয়েছিলেন। হিটলার ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জার্মানির চ্যান্সেলর এবং ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সে-দেশের ফিউরার ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেনাদলে যোগ দেন। পরে ভাইমার প্রজাতন্ত্রে কুখ্যাত নাৎসি পার্টির নেতৃত্ব লাভ করেন। মোহনীয় বক্তৃতার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, ইহুদিবিদ্বেষ ও সমাজতন্ত্র-বিরোধিতা ছড়াতে থাকেন। এভাবেই একসময় জনপ্রিয় নেতায় পরিণত হন। নাৎসিরা তাদের বিরোধীপক্ষের অনেককেই হত্যা করেছিল এবং সর্বোপরি একটি ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৯৩৯ সালে জার্মানরা পোল্যান্ড অধিকার করে এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। অবশেষে মিত্রশক্তি বিজয় লাভ করে। ১৯৪৫ সালের মধ্যে জার্মানি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। হিটলারের রাজ্যজয় ও বর্ণবাদী আগ্রাসনের কারণে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে পরিকল্পনামাফিক হত্যা করা হয়। ইহুদিনিধনের এই ঘটনা ইতিহাসে হলোকস্ট নামে পরিচিত। রেড আর্মি যখন বার্লিন দখল করে নিচ্ছিল, সেরকম সময়ে ইভা ব্রাউনকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর ২৪ ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই তিনি ফিউরার ব্যাঙ্কারে সস্ত্রীক আত্মহত্যা করেন। দিনটি ছিল ৩০ এপ্রিল ১৯৪৫। তাঁর নৃশংসতা এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে, একনায়ক বা ডিকটেটর এবং হিটলার শব্দটি পরে সমার্থক হয়ে যায়।

মে কথা

২২ মে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে আধুনিক ভারতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা এবং দার্শনিক।

তৎকালীন রাজনীতি, জনপ্রশাসন, ধর্মীয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখতে পেরেছিলেন। সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত হয়েছেন সতীদাহপ্রথা বিলুপ্ত করার প্রচেস্টার জন্য। তখন হিন্দু বিধবা নারীদের স্বামীর চিতায় সহমরণে যেতে বা আত্মাহুতি দিতে বাধ্য করা হত। রামমোহন রায় কলকাতায় অগাস্ট ২০, ১৮২৮ সালে ইংল্যান্ড-যাত্রার আগে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে এই ব্রাহ্মসমাজ এক সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন এবং বাংলার পুনর্জাগরণের পুরোধা হিসেবে কাজ করে। হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে রামমোহন রায়ের জন্ম এক সম্ভ্রান্ত ও কুলীন হিন্দু পরিবারে। প্রপিতামহ কৃষ্ণকান্ত ফারুখশিয়ারের আমলে বাংলার সুবেদারের আমিন ছিলেন। সেই সূত্রেই 'রায়' পদবির ব্যবহার বলে অনুমান। কৃষ্ণকান্তের কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজবিনোদ রামমোহনের পিতামহ। পিতা রামকান্ত। পনেরো-ষোলো বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে নানা স্থানে ঘোরেন। কাশীতে ও পাটনায় কিছুকাল ছিলেন এবং নেপালে গিয়েছিলেন। বারাণসী থেকে সংস্কৃত শিক্ষার পর তিনি পাটনা থেকে আরবি ও ফারসি ভাষা শেখেন। পরে ইংরেজি, গ্রিক ও হিব্রু ভাষাও তাঁর আয়ত্তে আসে। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ফারসি ভাষায় লেখা (ভূমিকা অংশ আরবিতে) 'তুহফাতুল মুহাহহিদিন'। বইটিতে একেশ্বরবাদের সমর্থন আছে। এরপর একেশ্বরবাদ

(বা ব্রাহ্মবাদ) প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেদান্ত-সূত্র ও তার সমর্থক উপনিষদগুলি বাংলায় অনুবাদ করে প্রচার করতে থাকেন। রক্ষণশীল ব্যক্তিরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর লেখার প্রতিবাদ করতে লাগলেন। রামমোহনও প্রতিবাদের প্রতিবাদ করলেন যুক্তি দিয়ে ও ভদ্র ভাষায়। রামমোহন ১৮৩১ সালে মুঘল সাম্রাজ্যের দূত হিসেবে বিলেত যান। ১৮৩৩ সালে মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয়ে ব্রিস্টলের কাছে স্টেপলটনে এই মহামনীষীর মৃত্যু (২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩) হয়। ব্রিস্টলে আর্নস ভ্যাল সমাধিস্থলে তাঁর সমাধি রয়েছে। ১৯৯৭ সালে মধ্য ব্রিস্টলে তাঁর একটি মূর্তি স্থাপিত হয়েছে।

জুন কথা

২ জুন ২০১৪, অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে গঠিত হয় ভারতের উনতিরিশতম রাজ্য তেলেঙ্গানা। তেলেঙ্গানা নামটি তেলুগু শব্দ থেকে এসেছে। এই শব্দটি তেলুগু ভাষাভাষী-অধ্যুষিত অঞ্চলটিকে বোঝায়। 'ত্রিলিঙ্গা দেশ' কথাটি 'তেলেঙ্গানা' শব্দের মূল উৎস। ত্রিলিঙ্গা দেশ কথাটি থেকেই 'থেলিঙ্গা', 'তেলুঙ্গা', 'তেলুগু' শব্দটি এসেছে। পূর্বতন হায়দরাবাদ রাজ্যের মরাঠি-অধ্যুষিত অঞ্চল মরাঠাওয়াড়ার থেকে তেলুগু-অধ্যুষিত অঞ্চলটিকে আলাদা করে বোঝাতে 'তেলেঙ্গানা' কথাটি ব্যবহৃত হত।

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চল নিজাম-শাসিত দেশীয় রাজ্য হায়দরাবাদের (মেদক ও ওয়ারঙ্গাল ভিভাগ) অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৮ সালে ভারতভুক্তির আগে পর্যন্ত এই অঞ্চল হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের উদ্দেশ্যে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠিত হয়। ১৯৫৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তেলেঙ্গানার নেতৃবৃন্দ ও অন্ধ্রের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের সংযুক্তি বিষয়ে একটি চুক্তি হয়। চুক্তির শর্ত ছিল, তেলেঙ্গানার স্বার্থ বজায় রাখা হবে। ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্র রাজ্য যুক্ত হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য গঠিত হয়। ২০১৪ সালের ২ জুন অন্ধ্রপ্রদেশ পুনর্গঠন আইন অনুসারে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১০-টি জেলা নিয়ে ফের তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠিত হয়। তেলেঙ্গানার আয়তন ১,১৪,৮৪০ বর্গকিলোমিটার ও জনসংখ্যা ৩৫,২৮৬,৭৫৭ (২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে)। হায়দরাবাদ, ওয়ারঙ্গাল, নিজামাবাদ, তেলেঙ্গানা ও করিমনগর এই রাজ্যের চারটি প্রধান শহর। ■

লেখাপড়ার ফাঁকে ছোটোদের কল্পনা ডানা মেলে পাড়ি দেয় রূপ ও কথার দেশে। দিগন্তের নীল আর পরির পালক দিয়ে সেখানে তারা রচনা করে স্বপ্নের জগৎ। কাঁচা মনের সেইসব রং দিয়ে সাজানো এ-বারের পাতায় জীবনপুর (উত্তর চব্বিশ পরগনা) ক্যাম্পাসের পড়ুয়াদের ছবি।

১. মহম্মদ কামরুজ্জামান গাজী। নবম শ্রেণি।
২. আসিকুল ইসলাম। অষ্টম শ্রেণি।
৩. মহম্মদ মিনহাজ আলম। নবম শ্রেণি।
৪. সেখ আমান। নবম শ্রেণি।
৫. সায়ন মণ্ডল। নবম শ্রেণি।

আল-আমীনের উচ্চ-মাধ্যমিক শাখাসমূহ

ক্রম	শাখার নাম ও ঠিকানা	বিভাগ	শ্রেণি
০১	আল-আমীন মিশন, খলতপুর উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া, ৮৩৭৩০৫৮৭০৪	ছাত্র ও ছাত্রী	পঞ্চম থেকে দ্বাদশ ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স
০২	আল-আমীন মিশন, বেলপুকুর বংশীহারি, দ. দিনাজপুর, ৯৭৩৪৯৩২৯৯৪	ছাত্র ও ছাত্রী	পঞ্চম থেকে দ্বাদশ
০৩	আল-আমীন মিশন, পাথরচাপুড়ি সিউড়ি, বীরভূম, ৯৭৩৩০৫৯৬৬৬	ছাত্র ও ছাত্রী	পঞ্চম থেকে দ্বাদশ
০৪	আল-আমীন মিশন, পাঁচুড় বিধানগড়, কলকাতা, ৯৪৩৪৬১৭১৪৫	ছাত্র	একাদশ-দ্বাদশ ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স
০৫	আল-আমীন মিশন একাডেমি, মেদিনীপুর এলাহিগঞ্জ,প. মেদিনীপুর, ৯৫৯৩৪৩২৮৩০	ছাত্র ও ছাত্রী	পঞ্চম থেকে দ্বাদশ
০৬	আল-আমীন মিশন একাডেমি, মেমারি গ্রিন পার্ক, বর্ধমান, ৯৪৭৪৩৬২৯৮৬	ছাত্র ও ছাত্রী	নবম-দ্বাদশ ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স
০৭	আল-আমীন মিশন একাডেমি, মালদা মডেল মাদ্রাসা, মালদা, ৮৩৭৩০৫৮৬৯১	ছাত্র	একাদশ-দ্বাদশ ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স
০৮	আল-আমীন মিশন, বর্ধমান বর্ধমান হাই মাদ্রাসা, ৯১৫৩০৫৬৭৮	ছাত্র ও ছাত্রী	একাদশ-দ্বাদশ ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স
০৯	আল-আমীন মিশন একাডেমি, বেলডাঙা বড়োয়া, মুর্শিদাবাদ, ৮৩৭৩০৫৮৭৩০	ছাত্র	নবম থেকে দ্বাদশ
১০	রহমানি একাডেমি, ধুলিয়ান ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ, ৮৩৭৩০৫৮৬৮১	ছাত্র ও ছাত্রী	পঞ্চম থেকে দ্বাদশ
১১	আল-আমীন মিশন একাডেমি, চাপড়া চাপড়া, নদিয়া, ৮৩৭৩০৫৮৭৩১	ছাত্র ও ছাত্রী	একাদশ ও দ্বাদশ
১২	আল-আমীন মিশন একাডেমি, রামপুরহাট সুন্দিপুর মোড়, বীরভূম, ৮৩৭৩০৫৮৬৯২	ছাত্রী	একাদশ ও দ্বাদশ
১৩	আল-আমীন মিশন একাডেমি, সূর্যপুর বারুইপুর, দ. ২৪ পরগনা, ৮৩৭৩০৫৮৬৯৫	ছাত্র	একাদশ-দ্বাদশ ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স
১৪	আল-আমীন মিশন একাডেমি, উলুবেড়িয়া বাণীতবলা, হাওড়া, ৮৩৭৩০৫৮৭১৯	ছাত্র	জয়েন্ট এন্ট্রান্স
১৫	আল-আমীন মিশন একাডেমি, খলিসানি খলিসানি, হাওড়া, ৮১১৬৯৮৮১৩৯	ছাত্র	একাদশ-দ্বাদশ ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স
১৬	আল-আমীন মিশন একাডেমি, শিলিগুড়ি আশরাফনগর, জলপাইগুড়ি, ৮৩৭৩০৫৮৬৭০	ছাত্রী	একাদশ ও দ্বাদশ
১৭	আল-আমীন মিশন একাডেমি, নয়াবাজ ভিআইপি কলোনি, হাওড়া, ৮৩৭৩০৫৮৭২০	ছাত্র	একাদশ-দ্বাদশ ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স

ক্রম	শাখার নাম ও ঠিকানা	বিভাগ	শ্রেণি
১৮	আল-আমীন একাডেমি, উস্থি আঁধারমানিক, দ. ২৪ পরগনা, ৮৩৭৩০৫৮৬৯৮	ছাত্র	একাদশ ও দ্বাদশ
১৯	আল-আমীন একাডেমি, বর্ধমান নবাবহাট, বর্ধমান, ৮৩৭৩০৫৮৭৩৪	ছাত্রী	একাদশ ও দ্বাদশ
২০	আল-আমীন একাডেমি, উলুবেড়িয়া জগদীশপুর, হাওড়া, ৮৩৭৩০৫৮৭৪৩	ছাত্র ও ছাত্রী	একাদশ-দ্বাদশ ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স
২১	আল-আমীন একাডেমি, গলসি জগদীশপুর, বর্ধমান, ৯১৫৩০৫৬৭৮	ছাত্র	একাদশ ও দ্বাদশ
২২	জ্ঞান সঞ্চয় একাডেমি রতনপুর, মুর্শিদাবাদ, ৮৯৬৭২৩৩৯৯২	ছাত্র ও ছাত্রী	পঞ্চম থেকে দ্বাদশ
২৩	আল-আমীন একাডেমি, পাপুড়ি নানুর, বীরভূম, ৭৮৭২৩৮৮২৭৯	ছাত্র	পঞ্চম থেকে দ্বাদশ
২৪	আল-আমীন একাডেমি, বৈষ্ণবনগর ষোলো মাইল, মালদা, ৮৩৭৩০৫৮৬৯২	ছাত্রী	পঞ্চম থেকে দ্বাদশ
২৫	আল-আমীন মিশন একাডেমি, সিউড়ি চোড়া, বীরভূম, ৮৩৭৩০৫৮৭৬০	ছাত্র	একাদশ-দ্বাদশ ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স
২৬	আল-আমীন মিশন একাডেমি, নিউটাউন ডি জে-৪/৯, কলকাতা, ৯৭৩২৪৮০৫১৫	ছাত্র	জয়েন্ট এন্ট্রান্স
২৭	আল-আমীন একাডেমি, পাণ্ডুয়া পাণ্ডুয়া, হুগলি, ৮৩৭৩০৫৮৭১৪	ছাত্র ও ছাত্রী	পঞ্চম থেকে দ্বাদশ
২৮	আল-হেদায়েত মিশন রানিহাটি, হাওড়া, ৭২৭৮১১৬০০১	ছাত্রী	অষ্টম থেকে দ্বাদশ
২৯	আল-আমীন মিশন একাডেমি, ভাবতা বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ, ৯১৫৩১৫৮৬৩৯	ছাত্রী	একাদশ ও দ্বাদশ
৩০	আল-আমীন মিশন একাডেমি, ভাঙড় ভাঙড়, দ. ২৪ পরগনা, ৯৭৩৩০১৭৭৮০	ছাত্র	একাদশ-দ্বাদশ ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স
৩১	আল-আমীন মিশন একাডেমি, রাঁচি বরগাই রোড, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড ০৯০৮০৯০০৭৩	ছাত্র	একাদশ-দ্বাদশ ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স (ইংরেজি মাধ্যম)
৩২	আল-আমীন মিশন একাডেমি, পাটনা বরগাই রোড, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড ০৯০৮০৯০০৭৩	ছাত্রী	একাদশ-দ্বাদশ ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স (ইংরেজি মাধ্যম)
৩৩	আল-আমীন মিশন একাডেমি, হাউলি হাউলি, বরপেটা, অসম, ০৯৬১৩৪৪০২১০	ছাত্র	একাদশ-দ্বাদশ ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স (অসমীয়া)

আল-আমীন বার্তা

দেখে পড়ার । পড়ে দেখার

আল-আমীন মিশন

একটি পরিবার। এই পরিবারের সদস্য আপনিও।

পরিবারের মুখপত্র

আল-আমীন বার্তা

নিজে পড়ুন। অন্যকে পড়ান

AL-AMEEN MISSION STUDY CIRCLE

A unit of Al-Ameen Mission Trust for Competitive Examinations

SOME OF OUR SPECIAL ACHIEVERS IN WBCS

GROUP A (2010)
ALI AHMED ALAMGIR

GROUP A (2012)
JAHANGIR MOLLICK

GROUP A (2017)
MASUD KARIM SK

GROUP A (2014)
AZIZUL SK

GROUP A (2015)
RAMJAN ALI

GROUP A (2012)
RUHUL AMIN

GROUP A (2017)
SELIM HABIB

GROUP B (2013)
SHAYAN AHMAD

GROUP B (2013)
AZHARUDDIN KHAN

GROUP B (2015)
SK SAMSUDDIN

SUCCESS IN WBCS 2017

GROUP A
H LASKAR

GROUP A
MD HASANUL ISLAM

GROUP C
ABDUL SATTAR

GROUP C
ANARUL ISLAM

GROUP C
AKHER ALI SK

GROUP C
BASIDUL AKTER

GROUP C
WAHED RAHAMAN

GROUP C
MD JASIMUDDIN

GROUP C
HASIBUR RAHAMAN

GROUP C
SAHID ANWAR

GROUP C
HASNAT MALLICK

GROUP C
MIJANUR RAHAMAN

ADMISSION GOING ON FOR

■ WBCS ■ COMBINED COURSES (MISC, CLERKSHIP, SSC, RAIL etc.) ■ XI-XII BOARD PREPARATION
■ 2-YR MEDICAL & ENGG COACHING ■ 1-YR MEDICAL & ENGG COACHING

Office: 8D Darga Road, Kolkata 17, Ph.: 033-2289 3769, 74790 20079, E-mail: aamstudycircle@gmail.com